



রাকা (সেতু)

জুম ইস্‌থেটিক্স কাউন্সিল (জাক)



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

ৰাকা (সেতু)

বৈসুক-সাংঘাই-বিঝু সংকলন '৯৮

□ সম্পাদক
সুখেশ্বৰ চাকমা (পল্টু)



জুম ঈস্থেটিক্‌স কাউন্সিল (জা-ক)

JUM AESTHETICS COUNCIL

ৰাঙ্গামাটি পাৰ্বত্য জেলা ।

বাক্য

(সেতু)

বৈসুক-সাংগ্রাহি-বিবু সংকলন '৯৮

□ প্রকাশকাল

এপ্রিল, ১৯৯৮ ইংরেজী

বৈশাখ, ১৪০৫ বাংলা

□ সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক	- সুখেশ্বর চাকমা পল্টু
সদস্য	- শিশির চাকমা
"	- মৃত্তিকা চাকমা
"	- হেমল দেওয়ান
"	- অপুল ত্রিপুরা
সদস্যা	- হ্যাভি চাকমা

□ প্রকাশনায়

জুম ইস্‌থেটিক্স কাউন্সিল (জা-ক)

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

□ প্রচ্ছদ

চাকমা প্রবীন খীসা তাতু

□ কম্পিউটার কম্পোজ

রনন দেওয়ান, গ্রীনহিল, রাজবাড়ী

ও

ওশিন এন্টারপ্রাইজ

নিউ কোর্ট রোড, রাঙ্গামাটি।

□ মূদ্রণ

কালার ক্রীণ প্রেস, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩ ৪৭ ১৫

ওভেচ্ছা মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র।

MAILING ADDRESS :

JUM AESTHETICS COUNCIL

POST BOX NO. - 5, POST CODE NO.- 4500

RANGAMATI, BANGLADESH.

উৎসର୍ଗ

স্বনাম খ্যাত চাকমা সাহিত্যিক
শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা'র
স্মরণে

সম্পাদকীয়

পার্বত্য আদিবাসীদের কাছে নতুন আমেজ ও চেতনা নিয়ে এসেছে এবারের বৈসুক-সাংগ্রাহী-বিশ্ব '৯৮। সবাইকে বৈসুক, সাংগ্রাহী ও বিশ্বের অভিনন্দন।

গ্রুম ইন্সটিটিউটস কাউন্সিল (জাক) পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের নিয়ে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ আদিবাসীদের ঐতিহ্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যভরা সংস্কৃতিকে মিলন মেলায় পরিণত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। তাই এবারের সংকলনের নামকরণেও যুক্ত হয়েছে ডিন্মায়া। সংকলনের নাম রাখা হয়েছে 'রাকা'। চাক ভাষায় 'রাকা' শব্দের অর্থ 'সেতু'। আমরা আদিবাসীদের মধ্যে মজবুত ও টেকসই রাকা বা সেতু চাই। যে সেতু হবে সংস্কৃতি। আমরা স্বকীয়তা বজায় রেখে সুস্থ সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

খ্যাতিমান লেখক যামিনী রঞ্জন চাকমা গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ইং তারিখে মৃত্যু বরণ করেছেন। এ সমাজ সচেতন লেখকের মৃত্যুতে আদিবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তার একটি অপ্রকাশিত লেখা 'আমার মৃত্যুর পর' এ সংকলনে প্রকাশ করা হলো। এছাড়াও গত ১৭ই জানুয়ারী '৯৮ তারিখে জাক-এর সহ-সভাপতি হেমল দেওয়ানের পিতা বাবু গিরীন্দ্র বিজয় দেওয়ান হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আমরা শোক প্রকাশ করছি।

গ্রুম ইন্সটিটিউটস কাউন্সিল (জাক) আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা '৯৮ ও সংকলন 'রাকা' প্রকাশের যে আয়োজন করেছে, এ আয়োজনের পেছনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তি জনাব মামুনুর রশীদেব ভূমিকা পালিত্ব এর মত। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে যে সময় এবং শ্রম আমাদের জন্য দিয়েছেন, এতে আমরা কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমরা অনেকের অকৃত্রিম সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি, যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে মহত্তর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, তাদের সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সতর্কতা সত্ত্বেও খুবই তাড়াহুরো করে এ সংকলনের কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল ও মূদ্রণ প্রমাদ এড়ানো গেলনা। এজন্য আমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আশা রাখি।

সূচীপত্র

প্রোফাইল :

৬

শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা

প্রবন্ধ :

৭ - ৫৪

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা সমূহের পরিচিতি	: সুগত চাকমা (ননাধন)
সংস্কৃতি কর্মীর ভূমিকা	: মামুনুর রশীদ
পাহাড়, পাহাড়	: আলী যাকের
আমার মৃত্যুর পর	: শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা
বাংলাদেশের সংবিধান ও	
দেশের আদিবাসী জনগণ	: রাজা দেবশীষ রায়
মঙ্গল সূত্র : অনন্য জীবন বিধান	: শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো
"সবাই গেছে বনে", "বনে চল যাই"	: ভগদত্ত খীসা
জয়চন্দ্র গিংখুলী	: শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
ত্রিপুরা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান	: আজাদ বুলবুল
ত্রিপুরা জাতির লোক নৃত্যের আদিরূপ	: অপুল ত্রিপুরা
গেঙউলী : অন্ধকার যুগের পথিক	: সুখেশ্বর চাকমা (পল্টু)
চাকমা ছোটগল্প : একটি পর্যালোচনা	: শিশির চাকমা
হিল চাদিগাঙের পঙ্কজন - ৪	: বিমিত বিমিত চাকমা

কবিতা ও গীত :

৫৫ - ৭৪

- ১। তরুন চাকমা [মনিবো], ২। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা, ৩। শ্যামল তালুকদার, ৪। মৃত্তিকা চাঙমা, ৫। তরুন কুমার চাকমা, ৬। অমর শান্তি চাঙমা, ৭। চাকমা প্রবীন খীসা তাতু, ৮। মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ৯। Mathura Tripura Yarwng, ১০। অন্ধকবি পরমানন্দ বিকাশ দেওয়ান, ১১। অমলেন্দু বিকাশ চাকমা, ১২। চাঙমা সীমা দেবান, ১৩। কিশলয় চাকমা, ১৪। কমল চাকমা, ১৫। নিকোলাই চাকমা, ১৬। রিপ রিপ চাঙমা, ১৭। সোমেন চাকমা, ১৮। মহতী চাকমা।

গল্প :

৭৫ - ৮৬

থক চানা	: মানস মুকুর চাকমা
তুও দোল সরানান [জাপানী গল্প]	: অনুবাদ - লুগ্‌চান চাঙমা
গধারামর স্ববন	: শান্তিময় চাকমা

রম্য রচনা :

৮৭ - ৮৮

বুচ পেলে ?	: সুনির্মল চাকমা
------------	------------------

যামিনী রঞ্জন চাকমার প্রোফাইল

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার লংগদু থানার তুলাবান গ্রাম, যা কর্ণফুলী হ্রদে তলিয়ে গেছে। এ গ্রামেই ১৯১৩ ইংরেজী ৭ই ডিসেম্বর রবিবার লেখক ও সমাজকর্মী শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগত চন্দ্র চাকমা (প্রকাশ জন্মের খাঁ) এবং মাতা সোনামাদুলী তালুকদার। তিনি তুলাবান গ্রামের প্রথম বৃত্তিধারী ছাত্র (১৯৬২), প্রথম মেট্রিকুলেট (১৯৩৬), প্রথম সরকারী চাকুরীজীবী (১৯৪২), প্রথম গেজেটেড অফিসার (১৯৬৮) ও প্রথম সরকারী পেনশনার (১৯৬৯) ছিলেন।

ছাত্র জীবন, চাকুরী জীবন ও অবসর জীবনে কলিকাতা, আগরতলা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ধর্মীয় ও বহু সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

তিনি একজন মননশীল প্রবন্ধ ও কথিকা লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা বহু কথিকা চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিবচরণ, কালিন্দী রাণী, রাজর্ষি, সাধেংগিরি, লক্ষীপালা, চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত তাঁর লেখা 'চাকমা দর্পণ' চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। চাকমা দর্পণ গ্রন্থে তিনি চাকমা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। চাকমা দর্পণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তিনি সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে ব্যাপকভাবে আদৃত হন। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহু অপ্রকাশিত লেখা রয়েছে। যে লেখাগুলো প্রকাশিত হলে আরো অনেক কিছু জানা যাবে।

এ স্বনামখ্যাত লেখক গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ইং তারিখ নিজ বাসভবনে লোকান্তরিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা সমূহের পরিচিতি

সুগত চাক্মা (ননাখন)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে উত্তর অক্ষাংশের ২১০২৫/ থেকে ২৩০৪৫/ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯০০৪৫/ -এর মধ্যে ৫০৯৩ বর্গমাইল (ISHAQ- 1971) নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এর উত্তরে ও উত্তর পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার(বার্মা), দক্ষিণে ও পশ্চিমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। ১৮৬০ সালে যখন ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দিয়ে গঠন করেছিল তখন এর আয়তন ছিল প্রায় ৬৭৯৬ বর্গমাইল (LEWIN : 1869)। বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন কমে এটি বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভেঙ্গে তিনটি নতুন পার্বত্য জেলার সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে হলো- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল থেকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ভুক্ত লোকজনের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা নিম্নরূপ:-

১। চাক্মা (২,৩৯,৪১৭), ২। মারমা (১,৪২,৩৩৪), ৩। ত্রিপুরা (৬১,১২৯), ৪। ম্রো (তাদের অনেকে মুরং নামেও তালিকাভুক্ত ২২,১৬৭), ৫। তঞ্চঙ্গ্যা (২২,০৪১), ৬। বম (৬,৯৭৮), ৭। পাংখোয়া (৩,২২৭), ৮। চাক (২,০০০), ৯। খ্যাং (তারা খিয়াং নামে তালিকাভুক্ত ১৯৫০), ১০। খুমি (তাদের নাম মুদ্রনজনিত ভুলে কোথাও কোথাও খুশী ইত্যাদি ১২৪১), ১১। লুসেই (তাদের অনেকে লুসাই নামেও তালিকাভুক্ত ৬৬২)। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষাগুলো নিয়ে লিখিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলোর নমুনা হিসেবে প্রথম এখানে শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন ফ্রান্সিস বুকানন। (Schendel 1992) তিনি ১৭৯৮ সালে একটি সরকারী কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে এলে ঐ সময় এখানকার বিভিন্ন ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর ফেইরী (১৮৪১), হান্টার (১৮৬৮) এবং লেউইন (১৮৬৯) এখানকার এবং আরাকানের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর ভাষার বিভিন্ন শব্দাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। তবে তারা সকলে শব্দ সংগ্রহের মধ্যেই তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এরপর যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলোর ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে প্রথম বারের মত তথ্যাদি প্রকাশ করেছিলেন তিনি হলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন। তিনি তাঁর সম্পাদিত “লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া” গ্রন্থটির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। গ্রীয়ারসন তার সম্পাদিত এই বিরাট গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড (১৯০৩ ইং) এর বিভিন্ন অংশে এখানকার ভাষাগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এখানকার ভাষাগুলোকে বিভিন্ন পরিবার, শাখা, দল ও উপদলে প্রাথমিক ভাবে শ্রেণীকরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের আমরা এখানকার এগারটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নয়টি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে তথ্যাদি পাই। গ্রীয়ারসন নিম্নরূপে এখানকার উক্ত নয়টি ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীকরণ করেন-

ক. ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবার :

ইন্দো-এরিয়ান শাখাঃ চাকমা

খ. তিব্বতী-চীন পরিবার :

টিবেটো-বার্মেন শাখা :

বোড়ো দল	: ত্রিপুরা
কুকি-চিন দল	: লুসেই
	: পাংখোয়া
	: বম
	: খ্যাং
	: খুমি
বার্মা দল	: ম্রো
সাক বা লুই দল	: চাক

এখন গ্রীয়ারসনের সময় (১৯০৩ ইং) সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত ৯৪টি বছর পেরিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দি আর মাত্র দু'বছরের কিস্তিতাধিক পরে শেষ হয়ে যাবে। এসে যাবে নতুন শতাব্দি একবিংশ শতাব্দি। তাই গ্রীয়ারসনের প্রায় শতবর্ষ পরে এখানকার জনগোষ্ঠীদের ভাষা ও উপভাষা গুলো কোন অবস্থায় উপনিত হয়েছে সে বিষয়ে যথার্থই গবেষনার প্রয়োজন রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এখানকার ভাষাগুলো সম্পর্কে পাঠকদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত মূলক মৌলিক শব্দ (Swadesh:1972) বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

১. প্রথমে সংখ্যাবাচক প্রথম ৫টি শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক-

১.১	বাংলা	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
	এক	এক	এক
	দুই	দুই	দুই, দি
	তিন	তিন	তিন
	চার	চের	চের
	পাঁচ	পাচ	পাচ

১.২।	বাংলা	তিব্বতী		বার্মী	
		লেখা	কথা	লেখা	কথা
	এক	জিগ	চিগ	তা, ত্যাচ	তা, তাইত্
	দুই	দুইস্	এই	নাঃ্	নাইত্
	তিন	জুম্	জুম্	থুম্	থুম্
	চার	বজি	জি	লে	লো
	পাঁচ	লুগা	ঙা	ঙা	ঙা

১.৩।	বাংলা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক
	এক	তয়	লক্	সা	তইক্
	দুই	নংয়	প্রে	নোই	নিং, ফি
	তিন	সুং	সুন	থাম্	সুং
	চার	লে	তালি	ক্রই	লে, প্রি
	পাঁচ	ঙা	তাঙা	বা	ঙা

১.৪।	বাংলা	লুসেই	পাংখুয়া	বম	খ্যাং	খুমি
	এক	খাত্	খাকা	খাত্	হাত্	হা এ
	দুই	নিং/ফি	পানিকা	পানি	ফি	হু
	তিন	থুম্	থুম্	থুম্	থুম্	থুম্
	চার	লি	লি	লি	হ্রি	পলু
	পাঁচ	ঙা	পাঙা	পাঙা	ঙ	পান্

উপরে প্রদত্ত সংখ্যা বাচক শব্দগুলোর আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, বাংলা সংখ্যা বাচক শব্দগুলোর সাথে চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যা বাচক শব্দগুলোর মিল আছে। এর কারণ হলো চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত। এবার অন্যান্য ভাষার শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করা যাক। তিন শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা তিব্বতী বা ভোট ভাষায় পাই ‘জুম’ (*Dsum*), বর্মীতে থুম্ (*Thum*), এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মার্মাতে ‘সুং’ (*Sung*), ম্রো-তে ‘সুন’ (*Sun*), ত্রিপুরায় ‘থাম্’ (*Tham*), চাকে ‘সুং’ (*Sung*), লুসেইয়ে ‘থুম্’ (*Thum*), খ্যাং-এ ‘থুম্’ (*Thum*), পাংখুয়াতে ‘থুম্’ (*Thum*), বমে ‘থুম্’ (*Thum*) এবং খুমীতে ‘থুম্’ (*Thum*)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তিন শব্দের প্রতিশব্দের ক্ষেত্রে তিব্বতী ও বর্মী শব্দগুলোর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মার্মা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, লুসাই, পাংখুয়া, বম, খ্যাং এবং খুমী এই নয়টি ভাষার প্রতিশব্দ গুলোর মিল আছে। এর কারণ হলো এই নয়টি ভাষা ও উপভাষা সিনো-টিবেটান বা ভোট চীন পরিবারের টিবেটো-বার্মেন বা ভোট বর্মী শাখার অন্তর্গত। এগুলোর মধ্যে ত্রিপুরা ভাষা বা “ককবোরক” এবং লুসেই ভাষা বা “দুলি এ্যান টং” ভাষা হিসেবে কোথাও কোথাও গুরুত্ব পেয়েছে।

২. এবার ভোট বর্মী শাখার কুকী চীন দলের ভাষাগুলোর কথায় আসা যাক। পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়টি ভোট বর্মী ভাষার মধ্যে লুসেই, পাংখোয়া, বম, খ্যাং এবং খুমী এই পাঁচটি ভাষা একটি দলের মধ্যে পড়ে যার নাম কুকি-চিন (*Kuki-Chin*) দল। নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলো লক্ষ্য করলে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

২.১।	বাংলা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক
	আগুন	মুইন্	মাই	হর্	ভাইঙ
	আমি	ঙা	আড়	আড়	ঙা
	চুল	চেম্বা	চাম্	খানাই	আফুমিঙ
	পাথর	কাক্	হয়া, রিয়া	হলঙ	তালুঙ
	শিং	আগ্রো	নাড়	বকরঙ	আরুঙ

২.২।	বাংলা	লুসেই	পাংখুয়া	বম	খ্যাং	খুমি
	আঙন	মেই	মেই	মেই	মেই	মাই
	আমি	কেই	কেই	কেই	কেই	কাই
	চুল	চাম্	চাম্	চাম্	লুসম্	চাম্
	পাথর	লুঙ	লুঙ	লুঙ	লুঙ	লুম্চেই
	শিং	কি	রাকি	কি	খি	টিকি.টিকি

উপরে ২.১ এবং ২.২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে ‘আমি’ শব্দের প্রতিশব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ‘আমি’ শব্দের প্রতিশব্দ মারমা ও চাকে ‘ঙা’ (Nga) এবং ত্রো ও ত্রিপুরা ‘আঙ’ (Ang), কিন্তু লুসেই, পাংখুয়া, বম ও খ্যাং ভাষাগুলোতে আমি শব্দের প্রতিশব্দ হলো ‘কেই’ (Kei) এবং খুমিতে ‘কাই’ (Kai) আবার ‘শিং’ শব্দের প্রতিশব্দ আমরা পাই মারমাতে ‘আগ্রো’ (Agro), ত্রোতে নাঙ (Nang), ত্রিপুরায় ‘বকরঙ’ (Bokorong) এবং চাকে ‘আরুঙ’ (Arung) কিন্তু ‘শিং’ শব্দের প্রতিশব্দ আমরা এখানকার কুকি-চিন দলের ৫টি ভাষায় মধ্যে লুসেইয়ে ‘কি’ (Ki), খ্যাং-এ ‘খি’ (Khi), পাংখুয়াতে ‘রাকি’ (Raki), বমে ‘কি’ (Ki), খ্যাং-এ ‘খি’ (Khi) এবং খুমিতে ‘টিকি’ (Tiki) বা ‘টকি’ (Toki) পাই। সুতরাং উপরোক্ত সাদৃশ্য থেকে সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসেই, পাংখুয়া, বম, খ্যাং, এবং খুমি এই ৫টি কুকি-চিন ভাষাকে আলাদা করা যায়। এদের মধ্যে লুসেই, পাংখুয়া এবং বম এই তিনটি ভাষা মধ্য বা কেন্দ্রীয় কুকি-চিন (Central Kuki-chin) উপদলের অন্তর্গত এবং খ্যাং ও খুমি এই দুটি ভাষা দক্ষিণ কুকি-চিন উপদলের ভাষা। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি শব্দ দেওয়া গেল-

২.৩

মধ্য কুকি চিন				দক্ষিণ কুকি-চিন	
বাংলা	লুসেই	পাংখুয়া	বম	খ্যাং	খুমি
এক	খাত্	খাকা	খাত্	হাঁত	হা এ
উকুন	হ্রিক	রিক্	লুরিক্	হিক্	হি
পাখী	সাভা	ভা	ভা	হ	তাহ্
সবুজ	আহ্রিক	রিঙ	রিঙ	হেঙ, চিঙ	হি এ

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট-বর্মী শাখার বোড়ো (Bodo) দলের ভাষা হলো ত্রিপুরা ভাষা বা ককবোরক/ককবরক। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো।

বাংলা	বোড়ো	রাভা	ডিমাসা	হাজং	গারো	ত্রিপুরা
খাওয়া	চা	চা	জি	জি	চা	চা
দেখা	নু.নাই	নুক্	নাই	নু	নিঃ	নাই
ভাল	ঘাম্	নেম্	হাম্	-	নাম্	গাম্
মরা	খোই	সিঃ	তিঃ	থেই	সিঃ	থুই

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট-বর্মী শাখার বর্মীর একটি উপভাষা হলো মারমা। বর্মী ও মারমা শব্দগুলোর মধ্যে মিলের হার ৯০% এর ও অধিক। আলোচ্য প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির না করে এ বিষয়ে কেবল এ টুকুই বলা হলো। তবে এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ড ওয়ার্ক '৮৩' দেখতে পারেন।

৫. গ্রীয়ারসন ১৯২৭ সালে শ্রো ভাষাকে প্রথমে বার্মা দলভুক্ত করেছিলেন। পরে ১৯৩১ সালে তিনি শ্রো ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্ভুক্ত করেন।

৬. ভাষাবিদদের মধ্যে এখানকার এবং আরাকানের চাকদের ভাষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ রয়েছে। তাই ইদানিং চাক শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রীয়ারসন বার্মার কাদু (Kadu) এবং গানান (Ganan) ভাষাকেও চাক (Sak) ভাষার সাথে 'সার্ক' বা 'লুই' দলের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (Grierson : 1927) আলোচ্য প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার শব্দগুলোর যে ক'টি শব্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা থেকে এদের পরিবার, শাখা, দল ও উপদল সম্পর্কে ধারণা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস।

এবার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহৃত লিপির কথায় আসা যাক। পার্বত্য চট্টগ্রামে লিখার জন্য চাকমাদের নিজস্ব লিপি আছে। অতীতে চাকমা লিপি চাকমাদের ধর্মীয় শাস্ত্র 'আঘরতারা' এবং ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'তাহ্লিক শাস্ত্র' লিখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। চাকমারা বহু পূর্ব থেকে বৌদ্ধ ছিল (Taranatha : 1608)। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বিকৃত পালি ভাষায় তালপাতার উপর 'লুরি' নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরহিতেরা লিখতেন। ইদানিং লুরিদের অবস্থা প্রায় লুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে বলে বলা যায়। তদন্বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্ম চাকমা সমাজে স্থান লাভ করেছে এবং দিন দিন তার স্থান দৃঢ় হচ্ছে। চাকমা সাহিত্যে কবি শিবচরন (১১৮৪ সন/১৭৭৭ইং) প্রথম তাঁর রচিত 'গোব্বেন'লামা' নামক গীতিকাব্যে চাকমা লিপির ব্যবহার করেছিলেন। সেই থেকে প্রায় ১৮০ বছরেরও কিঙ্কিতাধিক সময়ের পর নোয়ারাম চাকমা (১৯৫৯ইং) এবং হরকিশোর চাকমা ছাপার অক্ষরে চাকমা বর্ণগুলো প্রকাশ করেছিলেন। নোয়ারাম চাকমার চাকমা বর্ণমালার বিষয়ে লিখিত বইয়ের নাম ছিল 'চাকমার পঞ্চম শিক্ষা'। এটি এদতৎকালে শিশুপাঠ্য বই হিসেবে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট টেক্সট বোর্ডের অনুমতি লাভ করেছিল। তবে এ বিষয়ে আর উন্নতি হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সাল থেকে 'জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর' (সংক্ষেপে জুভাপ্রদ) সহ অধুনালুপ্ত আরও কয়েকটি সাহিত্য গোষ্ঠী বাংলা বর্ণে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করে। জুভাপ্রদ ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর পরপরই 'জুম ইস্‌থেটিকস কাউন্সিল' (সংক্ষেপে জাক) এই ধারাকে ১৯৮১ সাল থেকে এখনও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় কবিতা, গান, গল্প ও নাটকের বই বেরিয়েছে এবং এক ডজনের চেয়ে অধিক চাকমা নাটক ইতিমধ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরাদের কেউ কেউ বাংলা বর্ণে ত্রিপুরা ভাষায় কবিতা, গান ইত্যাদির বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি প্রাথমিক ভাবে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সাল থেকে বাংলা বর্ণে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সের বই প্রকাশ করতে শুরু করে (অশোক কুমার দেওয়ান :

১৯৮২ইং)। এভাবে সত্তরের দশক থেকে বাংলা বর্ণে চাক্কা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষার শব্দসমূহের বর্ণান্তকরন ও ধ্বনি সমূহের লিপিবদ্ধিতর প্রচেষ্টা এখনও চলছে। তবে মারমা সমাজে এখনও বৌদ্ধভিক্ষুরা এবং ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে লেখালেখির কাজে বর্মী বর্ণের ব্যবহার করে থাকেন। তাদের সমাজে বর্মী ভাষায় আগেকার দিনে লিখিত নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে এবং তাদের সমাজে বহুঐতিহ্যপূর্ণ গানও প্রচলিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে ১৮৯৪ সালে 'লন্ডন ব্যাপ্টিস্ট মিশন'-এর পাদ্রী Lorrain এবং Savidge লুসেইদেরকে প্রথমে মিজোরামে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ঐ সময় খড়্গধরহ 'লুসাই ডিক্সিনারী' লিখার জন্য লুসেই ভাষার উপযোগী করে রোমান বর্ণগুলোকে ব্যবহার করেন। তার ফলে সেখানে পরবর্তীকালে লুসেই ভাষায় কেবল বাইবেল অনুবাদ করে ছাপা হয়নি লুসেইদের মধ্যে চিঠিপত্র ও বই পুস্তক লিখার কাজেও রোমান বর্ণ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং তা স্থায়ীত্ব অর্জন করে। বর্তমানে লোরেন (১৮৯৪ ইং)-এর শতবর্ষ পরে এখানকার লুসেই, বম এবং পাংখুয়া তিনটি জনগোষ্ঠীই চিঠিপত্রাদি লিখার কাজে রোমান বর্ণের ব্যবহার করছে। তবে লুসেই এবং পাংখুয়ারা রোমান বর্ণে লুসেই ভাষায় তাদের চিঠিপত্রাদি লিখে থাকে। বমরাও লুসেইদের ভাষার শব্দাবলী ৫০% এর উপর বুঝতে পারে। ইদানিং তারা রোমান বর্ণে তাদের ভাষায় চিঠিপত্রাদি লিখার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিখার কাজে এখনও কোন বর্ণমালার ব্যবহার নেই। তবে ইদানিং শ্রোদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন একটি বর্ণমালা চালু করার চেষ্টা করছেন। তবে তা এখনও তাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়নি।

এবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। সেটা হলো যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরনাতিত কাল থেকে ১১টি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত রয়েছে সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা কিভাবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়। এর সহজ উত্তর হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে দ্বি-ভাষিকতা (Bilingualism) বা বহুভাষিকতা (Polylingualism) প্রচলিত রয়েছে। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা প্রায় সবাই ছিলেন বৃহত্তর চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর লোকেরাই কমবেশী চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা একটু আধটু বুঝতেন। অর্থাৎ অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ভাষা হিসেবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলার প্রচলন ছিল। বর্তমানে অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে শিক্ষিত লোকেরা বাংলায় কাজকর্ম করে থাকে এবং শিশুরা ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজে গিয়ে বাংলা এবং ইংরেজীতে লেখাপড়া করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে ও উত্তরাংশে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই দুইটি পার্বত্য জেলায় স্থানীয় লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হলো চাক্কা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থানীয় লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হলো মারমা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যাংশে ও উত্তরাংশে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ভাষা হিসেবে মারমা ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে দীঘিনালা থেকে মাটিরাঙ্গা হয়ে রামগড় পর্যন্ত মধ্যবর্তী অংশে ত্রিপুরা ভাষীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এখনও চোখে পড়ে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশে সাজেক থেকে ক্রমা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি অংশের লোকেরা এখন কমবেশী লুসেই ভাষা বা 'দুলিএ্যান টং' বুঝতে পারে। এই অবস্থায় এ এইচ এম জেহদুল কারিমের নিম্নলিখিত কথাগুলো দিয়ে প্রবন্ধটির ইতি টানছি তিনি বলেন "চাক্কা, লুসাই (লুসেই), মণ (মামমা) এবং ত্রিপুরা এই চারটি দল জনসংখ্যার বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামের

জনসংখ্যার প্রধান অংশটি গঠন করেছে এবং যাদের লিখিত ভাষাগুলো অন্যদেরকে প্রভাবিত করে। এই অবস্থায় আমি স্কুলসমূহে অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভাষাগুলোর ব্যবহারকরনের জন্য প্রস্তাব করছি। এটি তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার (সময়) ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক স্বাভাবিকতাকেও রক্ষায় সাহায্য করবে। সেই সাথে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাও চালু থাকবে যাতে তারা বাংলা শিখে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে" (A. H. M. Zehadul Karim : 1989 Pg. 175-176)।

রেফারেন্স :

- চাক্মা, সুগত ১৯৭৩ : চাক্মা-বাঙলা কথাতারা। (চাক্মা-বাংলা অভিধান)
রাস্গামাটিঃ জুমিয়া ভাষা প্রচারদপ্তর (জুভাপ্রদ)।
- ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল ১৩৯৬ঃ ত্রিপুরা বা ককবোরক ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ।
রাস্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (উ. সা. ই.)।
- দেওয়ান, অশোক কুমার (সম্পাদিত) ১৯৮২ : চাক্মা, মারমা, ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষা
কোর্সের প্রথম পাঠ।
রাস্গামাটি(উ. সা. ই.)।
- মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) ১৯৮৩ : ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ড ওয়র্ক' ৮৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা বিভাগ।

Grierson, G.A.(Comp.& ed.) 1903:Linguistic Survey of India.

Calcutta, Banarasi (reprint 1927)

- Hunter, W.W. 1868 : A Comparative Dictionary of the Non-Aryan
Languages of India and High Asia.
London : Trubner & Co.
- Ishaq, M(ed.) 1971 : Bangladesh District Gazetteer :
Chittagong Hill Tracts.
Dhaka : Government Press
- Lewin, T.H. 1869 The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers
therein Calcutta
- Maniruzzaman, 1984 : "Notes on Chakma Phonology". In :
Tribal Culture in Bangladesh.
M.S. Qureshi (ed.).
Rajshahi : Rajshahi University:
- Phayre, A. P. 1841 : Account of Araccan. J.A.S.B. No. 117.
- Swadesh, M. 1972 : "What is Glotochronology" In : The origin
and Diversification of language.
J. Serjer (ed.) London. Rout ledge K.K Paul Ltd.
- Karim, A.H.M Zehadul 1989: The Linguistic Diversity of the
Tribesmen of Chittagong Hill Tracts in
Bangladesh : A Suggestive Language
planning Rajshahi University :
Asian profile vol. 117. No. 2.

সংস্কৃতি কর্মীর ভূমিকা

মামুনুর রশীদ

আমি ঘটনাক্রমে আদিবাসীদের একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্র ছিল কানাডাতে। গেলো বছর আগে এর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগ হবার একটা সুযোগ হয়েছিলো। যদিও আমার কর্মক্ষেত্র ছিল আদিবাসীদের শিল্পের অনুসন্ধান। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে ক্রমাগতঃ ভাবে জড়িয়ে পড়ি তাদের সমাজ ভাবনা, সমস্যা ও সংকটের মধ্যে। নানা সংকটে নিপতিত এই আদিবাসীদের সাথে পরিচিত হবার পর বারবার তাকিয়ে দেখি আমাদের দেশের পরিস্থিতির দিকে।

সবচেয়ে যে সংকটে আদিবাসীরা নিপতিত - তা হলো মূল্যবোধের সংকট। এই সরল সহজ প্রকৃতির সন্তানরা আধুনিক জীবনের জটিলতা বুঝতে সক্ষম নয়। প্রতারণা, শিক্ষাকলা, জটিলতম রাজনৈতিক ভাবনা তাঁদের বোধের বাইরে। তার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন যাপন হয়ে পড়েছে প্রায় অসম্ভব। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা শত শত বছর লড়াই করেও তাদের অধিকার অর্জন করতে পারেনি। তাই এক ধরনের নিজবাসভূমে পরবাসী হয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

আমাদের দেশেও মূলতঃ মূল্যবোধের সংকট, উপমহাদেশ বিভাজনের পর তাদের মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন, সর্বোপরি যে সংঘাতগুলি তাদের উপর পাকিস্তান আমলে চাপিয়ে দেয়া হল তাতে নিজের অজান্তেই তারা নিপতিত হলো এক মহাসংকটে।

পাহাড়ে পাহাড়ে জুমচাষ করে একধরনের জীবন যাপনের মধ্যে অভ্যস্ত মানুষগুলি এক প্রত্যুষে অকস্মাৎ আবিষ্কার করলে এক মহাপ্রাবন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাদের সবকিছু। আশ্রয়হীন মানুষগুলি উপত্যকায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কার কাছে বিচার প্রার্থনা করবে ? কিয়ামৎ এর ঘন্টাধ্বনি কাউকে আকর্ষণ করলো। দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিলো ধর্মের কাছে। যারা আজ ভাস্তের দায়িত্বে নিয়োজিত।

দেশ স্বাধীন হবার পরও একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এক সময় তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ ভেবেছেন তার মধ্য দিয়েই হয়তো মুক্তি। একই ভূখন্ডের মধ্যে দ্রাতৃঘাতি এক লড়াই শুরু হয়ে গেলো। সম্প্রতি সে লড়াইয়ের এক শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক সাফল্যের বিষয় নির্ধারিত হবে অদূর ভবিষ্যতেই, কিন্তু সুদূর প্রসারী ফলাফলটি কিন্তু নির্ভর করবে সামাজিক অগ্রযাত্রার উপর। যে অগ্রযাত্রাকে প্রভাবিত করবে সংস্কৃতি। আর যে সংস্কৃতি মানে কিন্তু পশ্চিমাদের ধারণা ঈশঃৎব রং যিধঃ বি

ধংব নয়। আমরা যা হতে পারি সেই ভাবনাটাও আমাদের সংস্কৃতি। তাই মহাকাশে গড্ডলপ্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার নাম সংস্কৃতি নয়।

তাই যে কোন সমাজে কিছু চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। বেগবান হয় মানুষের চিন্তা ভাবনার ধারা। মানুষকে তাঁরা ভাবান, নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হন।

আজকে এই কাজটি করতে হয় সংস্কৃতি কর্মীদের।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বাসমূহের ভাবনাকে, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই মহত্তর ভাবনায় রূপান্তরের কাজটি সংস্কৃতি কর্মীদেরই করতে হবে। যে কোন জাতিসত্ত্বার মধ্যেই আছে পশ্চাৎপদতা, সংকীর্ণতা অশিক্ষাজনিত কুসংস্কার। এসবকে অতিক্রম করার স্বার্থে প্রয়োজন ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্ম। সাংস্কৃতিক কর্ম বলতে শুধু নাচ-গান বুঝলেই চলবে না। যা কিছু মহত্তম মানুষের সৃষ্টি করে, যা কিছু মানুষের মনোজগতে শুভ ও কল্যাণকর প্রভাব ফেলে তারই জন্যে এক নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

অনেক সময়ই আমরা দেখতে চাই, যারা জগতকে পাল্টাবে, মানুষের ভাবনার রাজ্যে কারিগর হিসাবে কাজ করবে তারাই নানাধরনের কূপমন্ডুকতার মধ্যে পড়ে আছে। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের সচরাচরই হচ্ছে। আশাকরি আমাদের আদিবাসী সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে সে সংকট হবে না।

পাহাড়, পাহাড়

আলী যাকের

খাগড়াছড়িতে অস্ত্র জমা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী যাবেন। দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর টেলিভিশনের জন্য বলাবলি করার। বাংলাদেশের সর্বত্র, যে কোন কারনে, অথবা বিনা কারনে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা। অতএব, এই সুযোগ ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। একই গাড়ীতে আমার সহযাত্রী সুহৃদবর, প্রথিতযশা সাংবাদিক প্রাবন্ধিক আবেদ খান এবং অনুজপ্রতীম বন্ধু শাহরীয়ার কবির। ১০ই মার্চ অনুষ্ঠান। খাগড়াছড়ি পৌঁছলাম ৯ তারিখ রাতে।

খাগড়াছড়ি ছোট শহর। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন অনেক লোক। থাকার জায়গা অপ্রতুল। যদিও জেলা প্রশাসন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সবাইকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে। যার যেমন পদমর্যাদা সে অনুযায়ী থাকবার জায়গায় বন্দোবস্তী করে দিতে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম খাগড়াছড়ির ওপর আর চাপ সৃষ্টি করা নয়। একমাত্র বিকল্প রাস্তামাটিতে রাত কাটানো। রাস্তামাটি সন্তর-বাহাত্তর কিলোমিটার দূরে। সিদ্ধান্ত নিতে, নিতে বেজে গেছে রাত ন'টা। আমার বাহনটির চালক বৃদ্ধিমান যুবক। সে ইতোমধ্যে বেশ কিছু যানবাহনের চালকের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। বেশিরভাগ চালক বলেছে রাস্তামাটি যেতে সময় লাগবে তিন ঘন্টা। পথ বিপদসংকুল। ডাকাতরা শান্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে গাড়ী আটকে ডাকাতি করে। অতএব, যাওয়া না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমার ওপরে। আমি যখন ভাবছি কি করবো, না করবো তখন আমার গাড়ীর চালক একটু আমতা-আমতা করে বললো, একজন পাহাড়ী ড্রাইভার অবশ্য বলেছে সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। পথে তেমন কোন ঝামেলাও নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নিশ্চিত ঐ ড্রাইভারটি পাহাড়ী? ও বললো, জী। আমি বললাম, তাহলে যাবো। এটা ওদের এলাকা। ওরা আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে। আমার সাথে একমত আমার সহযাত্রীদ্বয়। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তামাটির পথে। তখন রাত পৌনে দশটা। সেই রাতে চাঁদ উঠেছিলো আকাশে। চাঁদ!

শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে পড়তেই রূপালী চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো প্রকৃতি। শহরের বাইরে পাহাড় ঘেরা প্রাম্য জনপদ। অতো রাতেও বাঁধ-ভাঙা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব। একবারে দিনের মতই স্বচ্ছ। দূর, দূরান্তে উঁচু পাহাড়। মাঝে, মধ্যে উপত্যকা। হঠাৎ, হঠাৎ করেই অত্যন্ত সীমিত ঘরবাগি সম্বলিত গ্রামের আভাস। কদাচিত একটা টিম্টিমে হ্যারিকেনকে ঘিরে, রাতজাগা প্রবীনদের আলাপচারিতা। আমরা নিরব। আমি ভাবছিলাম, ওরা নিশ্চই ভাবছে কাল থেকে জীবন কেমন হবে? এক প্রত্যুষে কি বদলে যেতে পারে সব?

পরের দিন ভোর বেলায় রওয়ানা হলাম খাগড়াছড়ির পথে। শুরুতে সবকিছু একেবারে গুন্‌শান-শান্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গায়ের ঐ কলিগুলো মনে ভীড় করে এলো, এমন শান্ত নদী কাহার? কোথায় এমন ধুম্রপাহাড়, কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেলে...! গিঞ্জের অজান্তেই গুন, গুন করে গাইতেইও শুরু করেছিলাম বোধহয়। আবেদ বলে উঠলো, বাহ

তোমার বেশ বেসুরো গলাতো ? হঠাৎ অ-প্রস্তুত হয়ে গেলাম। দিনের আলোয় পাহাড়ী জীবন চাঁদ-ধোয়া রাত থেকে ভিন্ন দেখাচ্ছিলো। জোৎস্না-স্নাত প্রকৃতির ইন্দ্রজাল রোদ্দুরের প্রখর আলোয় রুঢ় বাস্তবতার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা চমকে উঠে আবিষ্কার করি কত দারিদ্র, কত মিথ্যা আশাবাদ, কত বঞ্চনার সাথে এঁদের বসবাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের কি অভাব আছে ? জীবনশক্তির ? সত্যি বলতে কি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। সেই ষাটের দশকে, আজও মনে আছে, রাজমাটি লেকের মাঝখানে বাংলা প্যাটার্নের একটি হোটেল কেউ খুলেছিলেন। আমার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমি সেখানে দু'টি শান্তিময় রাত কাটিয়েছিলাম।

গণতন্ত্রের অর্থ কি ? আমরা মনে করি গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমস্ত সিদ্ধান্তের অধিকার। আসলে গণতন্ত্র সম্বন্ধে এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত একটি ধারণা। গনতান্ত্রিক মতে এবং গণতান্ত্রিক পথানুযায়ী, একজন ব্যক্তিও যদি ভিন্ন ধর্ম কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হন তবে তার মতামতকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমান স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দেশে গণতন্ত্রের এই বিশ্বস্বীকৃত সংজ্ঞা মানা হয়না। এতেকরে গণতন্ত্রের কোনক্ষতি হচ্ছেনা, হচ্ছে আমাদের জাতি হিসেবে!

সেই ১০ই মার্চ সকালে যখন ঋগড়াছড়ি ফিরছিলাম তখন হাজার, হাজার পাহাড়ী মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছিলো ঋগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের দিকে। প্রত্যেকের মনে প্রত্যয়, মুখে হাসি। এমন নির্মল হাসি জীবনে কোনদিন ঢাকায় দেখিনি।!

আমি ওঁদের শতায়ু কামনা করি এবং বাঙালী পাহাড়ীরা তাদের নিজস্বতা বজায় রেখে যেনো একই সংবিধান এবং রাষ্ট্রের মধ্যে হাতে-হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারে, সেই কামনা করি।

আমার মৃত্যুর পর

শ্রী যামিনী রঞ্জন চাক্‌মা

মৃত্যু সকলের বেলায় অবধারিত। কে কখন মরবে তার কোন নির্ধারিত পন্থা নাই। ইহা সকলের বিশ্বাস যে মানুষ বুড়ো হলে মরে আবার নিকট ঘনিষ্ট আত্মীয়ের ঘরে পূনর্জন্ম নেয়। এটা চাক্‌মাদের সরল বিশ্বাস। তাই চাক্‌মারা পরলোকগত জ্ঞাতি উপরিষ্টদের উদ্দেশ্যে “আগ বাড়ায়” অর্থাৎ পিণ্ডদান দিয়ে থাকে। তবুও এর ব্যতিক্রম করে অল্পবয়স্ক ছেলে পিলেরা বা মদ্যজাতকেরাও মৃত্যুবরণ করে থাকে। এর পেছনে যে কারণ আছে তাকে শাস্ত্রে তিন প্রকারে ভাগ করেছে। যেমন (১) আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু (২) কর্মক্ষয়ে মৃত্যু ও (৩) অপঘাতে মৃত্যু। বর্তমানে (ফেব্রুয়ারী’ ৯২ইং) আমার ৭৯ বৎসর বয়স চলছে। এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে তা কোন প্রকারের মৃত্যু হবে তা’ নির্ণয় করতে তারা, যারা আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবে ও মৃত্যুর কারণটা যথাযথ পর্যালোচনা করতে সক্ষম হবে।

কারো মৃত্যু হলে পর মুহূর্ত থেকে সচরাচর যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা নিম্নরূপ। ঘনিষ্ট আত্মীয়-আত্মীয়াদের বিশেষত যাদের বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে যে তারা তাদের প্রিয় বিচ্ছেদের ফলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়লো, প্রতিক্রিয়াটা বেশী হয়। কেউ কেউ বিনা বাক্য ব্যয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কেউ নির্বাক ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে, কেউ কাঁদতে কাঁদতে বেঁহশ হয়ে পড়ে। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়রা ও বন্ধু-বান্ধবরা নীরবে অশ্রুপাত করে। কেউ কেউ বিশেষত পুরুষ আত্মীয়-বান্ধবরা মৃত্যুর মুহূর্তে স্ট্র বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে চেষ্টা করে ইত্যাদি।

এখন আমার ব্যক্তিগত বেলায় ফিরে আসি। আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় বলতে আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, জামাই ও পুত্রবধূরা এবং ৭০ বৎসর বয়স্কা সহধর্মিনীকে বুঝানো হবে। ইতিমধ্যে আমার সহধর্মিনীর তিনবার ডাক্তার খানায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। শেষবার হলো ৪ঠা মে’ ৯১ইং হতে অক্টোবর’ ৯১ইং পর্যন্ত। জঙঘা অস্থির মাথায় ভঙ্গুর (Fracture at the neck of Femur) চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে ইহার শেষ চিকিৎসা করা হয়। যদিও এখন প্রানে বেঁচে আছে এই আঘাতটা কোন দিন আর স্বাভাবিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে তাকে চলার জন্য এখন আমার বা অন্য কারোর উপর নির্ভর করতে হয়। অতএব তাকে ফেলে আমার বেশীক্ষন বাইরে থাকা তার কাছে শক্তির সামিল। এ অবস্থায় আমার মৃত্যুটা হবে আমার সহধর্মিনীর বেঁচে থাকার এক চরম আঘাত Challenge। সেই-ই হবে প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম ও প্রধান শিকার। কিন্তু ইহার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা (Preventive measure) নেই। তৎসঙ্গে ছেলে-মেয়ের করুণ কান্না ও বিলাপ স্বাভাবিক। দূর আত্মীয়-আত্মীয়াদের সমাগম ও বিলাপ, বিশেষত যাদের বিপদের সময় আমার ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ ও অতি স্মরণীয়। বিগত জীবনে যে সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলেমিশে ছোট-বড়, সমাজ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাজ করেছি তারাও আমার মৃত্যুর মুহূর্তে বিমর্ষ হবে তা স্বাভাবিক। তবুও আমার শবদাহের তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ করতে ব্যস্ত দেখা যাবে। ইত্যবসরে আমার নিজের কণ্ঠে ধরা ধর্মীয় ক্যাসেটগুলো নাতিদের বাজাতে দেখা যাবে। বিবিধ গবেষণামূলক আমার হাতের লেখা ছাপানো ও অছাপানো পাতুলিপিগুলো কেউ কেউ নাড়াচাড়া করবে। তা দেখে নাতিও ছেলেরা সে সব সযত্নে রাখার আশায় অন্যত্র সরিয়ে নেবে। সোজা কথা আমার এসব লেখা সমাজ ও ধর্মীয় দৃষ্টি

কোণ থেকে নগদ টাকা কড়ির চেয়ে অনেক মূল্যবান, ভবিষ্যত সমাজ দরদীরাই সে সপ্নের প্রকৃত মূল্যায়ন করবে। সমাজের মধ্যে আমার অনেক সহকর্মী এসে সে সব লেখা সংরক্ষণের ভূমিকা নেবে। কেউ কেউ আমার ব্যবহৃত কাপড় চোপেরগুলো এক স্থানে জড়ো করে রাখা ব্যবস্থা করবে। কোন কোন হীন স্বভাবের লোক আমার ব্যবহৃত জামা কাপড় গোপনে তুলে নেবার চেষ্টা করবে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের আগাম বলা যাবে। তবুও তা 'থেকে বিনত থাকলাম। তাদের নাম আগাম বলতে পারার কারনটা হলো আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা। আমার জীবনে বহু মৃত ব্যক্তির শবদাহের কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেছি। তাতে যা দেখেছি সে সব পুঁজি করে ঐ উপরোক্ত মন্তব্য করার সাহজ পেয়েছি।

দাহ ক্রিয়ায় রওয়ানা দেবার আগে আমার কানজাবা ভাত রান্না নিয়ে অন্দর মহলে বিতর্ক আরম্ভ হবে। কেউ বলবে চাকমা সমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পুত্র বধুরাই পরলোকগত শশুর-শাশুরীর কানজাবা ভাত রান্না করে। কাজেই আমার তিন পুত্র বধুর মধ্যে যে কোন একজনে সে কাজ করবে। কেউ বলবে যেহেতু এতদিন যাবৎ জীবদ্দশায় মেঝে বধু রান্না করে খাওয়ায়ছিল। সে-ই-ই আমার কানজাবা ভাত রান্না করবে। তখন আরম্ভ হবে আমার একাধিক সময়ের ঘোষনা-উবপষধৎঃরুড়হ, নিয়ে সমালোচনা। আমার ঘোষনা হলো আমার মৃত্যুর পর কানজাবা ভাত রান্না করবে আমার রক্তের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে তারাই, অন্যেরা নহে। যেমন আমার আত্মজা, অর্থাৎ মেয়ে। আপন বোন, পিসী, ছেলে ঘরের নাতনী, নাতি, পুত্র, পৌত্র বা স্বগোত্রীয় মেয়ে বা পুরুষ যেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অপরিচ্ছেদ্য। চিতা সাজানো, আগুন দেয়া, পুতাস্থি বিসর্জন প্রভৃতি কাজ যেমন রক্তের সম্পর্কের টানে উত্তরাধিকার ভিত্তিতে হয়ে থাকে কানজাবা ভাত রান্না ও সেই ভিত্তিতে হবে।

চাকমাদের একটা অন্ধ কুসংস্কার আছে। তা' হলো বুধবারে চাকমাদের শবদাহ বা মরদেহ সংস্কার করা নিষেধ। চাকমাদের কোন কোন প্রবীন ব্যক্তি বলে থাকে যে বুধবারে দিনটা নাকি এত খারাব যে সে দিন নাকি হিংস্র সর্পও শিকারের জন্য গর্ত থেকে বের হয় না। আবার সেই প্রবীন চাকমারা বলে থাকে যে আকাশে তারা নক্ষত্র দেখা দিলেই বুধবারেও শবদাহের বিধান আছে। এ সব নেহাৎ ছেলে মানুষী কথা। আমার মতে বুধবারটা লক্ষীবার। যে দিন বিয়েত্রা স্বর্গ থেকে লক্ষীকে আমন্ত্রন করে মর্ত্যলোকে এনেছিল এবং তারপর দিন বৃহস্পতিবারে লক্ষীকে পূঁজা দেওয়া হয়। চাকমা কুল বধুরা তাই বুধ-বৃহস্পতিবারেই মা লক্ষীমাকে ভাত দিয়ে থাকে। অতএব মঙ্গলবার রাতে আমার মৃত্যু হলে বুধবারেই আমার শবদাহ করা হউক- ইহা আমার কাম্য। তাতে পুত্র-পৌত্রদের মঙ্গলই হবে। অন্যদিকে আমার নিজীব নশ্বর মরা দেহ পঁচে গলে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা থেকেও রক্ষা পাবে এবং শবদাহানুষ্ঠানে আগত লোকজনের অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টিও হবে না।

শবদাহের সময় শ্মশানে ভিক্ষুর উপস্থিতি প্রয়োজন পরে না তাতে মৃতদেহের লাভ-অলাভ বা মঙ্গল-অমঙ্গল কিছুই হয় না। কারোর মড়াদেহ সামনে রেখে ভিক্ষুর অনিত্য ধর্মের সুত্রপাত শ্রবন করার অর্থ হলো আমরা জীবন্ত মানুষ যেন সব সময়ে স্মৃতিতে ধারন করিয়ে উপস্থিত মৃত লোকটির ন্যায় জগতে সকলেই মরবে, অর্থাৎ অনিত্যধর্মের অধীন বা দুঃখের অধীন। এই অনিত্য ধর্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা যেন সচেতন থাকি। শ্মশানে যাবার

আগে মরদেহ সামনে রেখে ভিক্ষুর মুখে অনিত্য ধর্মের সূত্রপাত বাড়িতে শুন্যর পর সেই একই কথা শুন্যর জন্য ভিক্ষুকে শাশানে নেওয়ার প্রয়োজন করে না।

শবদাহের প্রাক্কালে আমার মরদেহ আমার আত্মীয়-আত্মীয়া বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের অনেকে টাকা কড়ি দিয়ে যাবে এবং কেউ কেউ মরদেহের পাঁ ছোঁয়ে বন্দনা করে যাবে। এতে আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনই প্রকাশ পাবে। কিন্তু তখনও আমি তাদের কোন উপকারে আসবো না। তা স্মরণ করে আমি আগাম সকলের হিত কামনা ও সাধন করার চেষ্টায় নিজেকে রত রাখার সংকল্প করি।

মরদেহের উপর প্রদত্ত টাকাকড়ি নিয়েও তখন বিতর্ক আরম্ভ হবে। কেউ বলবে ঐ সব টাকা কড়ি উপস্থিত ভিক্ষুককে দিতে, আবার কেউ বলবে ঐসব টাকা কড়ির কিছু অংশ ভিক্ষুকে দিয়ে বাকী অংশ দিয়ে সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়ার সময় সংঘ দানের ব্যবস্থা করা। আমার জীবদ্দশায় আমি পরের পদ্ধতিটাই এতদিন প্রচলিত রেখেছি। আমার বিশ্বাস আমার বেলায় ও তা' হবে।

চাক্‌মাৱা তাদের পরলোকগত আত্মীয়-আত্মীয়াদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপনের পর প্রায় ভুলে যায়। কেউ কেউ তিন বৎসর পর্যন্ত তাদের পরলোকগত মাতা-পিতার স্মরণে মৃত্যু দিবসে বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। তা-ও সবার বাধ্য বাধকতা নেই। অধুনা কোন কোন ক্ষেত্রে পরলোকগতদের স্মরণে শোক সভার আয়োজন করা হচ্ছে দেখা যায়। তবে বার্ষিক স্মৃতি-চারনের ব্যবস্থা এখনো দেখা যায় না। চাক্‌মা সমাজে প্রথম শোক সভা প্রবর্তন করেন শ্রীমান জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা-উকিল। ৩০শে এপ্রিল '৭৪ ইং সন্ধ্যা তার স্কুলের সহপাঠি বন্ধু শ্রীমান বিধান কৃষ্ণ দেওয়ানের অপঘাতে মৃত্যু হলে ওৱা মে'৭৪ইং শুক্রবার সন্ধ্যা আনন্দ বিহারে বিধানের স্মরণে এক শোক সভার আয়োজন করেছিলেন। সে দিন আমাকে বিধান স্মরণে কিছু বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করা হলে আমি কিছুই বলতে পারিনি। যেহেতু বিধান ছিল আমার একমাত্র শ্যালক, খুবই স্নেহদরের মানুষ। তার মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান। তার অকাল মৃত্যুতে আমি খুবই বিপর্যস্থ হয়ে পড়ি। তার পর আনন্দ বিহারেই দ্বিতীয় বারের মত শোকসভার আয়োজন করেছিলাম আমি ২৭শে জানুয়ারী '৭৬ ইং কামিনী বাবুর মৃত্যুর পর। ইহার পর আজকাল চাক্‌মা সমাজের পরলোকগত বিশিষ্ট লোকজনের স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একরকম শোকসভার পক্ষপাতি। ইহার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমাজের কৃতি সন্তানদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবো এবং তাদের আদর্শ অনুকরণ করে সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে ভূমিকা দিতে পারবো। আমি বিশ্বাস করি নিয়মিত ভাবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারন সমাজ উন্নয়নের সহায়ক হবে।

০৮-০২-৯২ ইং

বাংলাদেশের সংবিধান ও দেশের আদিবাসী জনগণ

রাজা দেবানীষ রায়

১৯৭২-এর সংবিধানঃ

একটি দেশের সংবিধানে সে দেশের জনগণের আশা, আকাংখা, নীতি-আদর্শ এবং প্রশাসনিক মূলনীতির প্রতিফলন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও নিশ্চয় তা হওয়ার কথা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইন পরিষদ দেশের সংবিধান প্রবর্তন করে।

এই সংবিধানে সমাজের অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত অংশের তথা নারী, শিশু, কৃষক ও অন্যান্য স্তরের জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ থাকলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের কোন উল্লেখ ছিল না। এছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও তার জনগণের বিশেষ মর্যাদার অস্বীকৃতির কারণে প্রতিবাদ হিসেবে নবগৃহীত সংবিধানটিতে স্বাক্ষর প্রদানে বিরত থাকেন।

১৯৭২-এর সংবিধানে পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহের পরিচয় ও স্বকীয়তাকে শুধু অস্বীকার করা হয়নি বরং ১৯৭২ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে অআদিবাসী জনগণসহ দেশের অধিকার সুযোগ বঞ্চিত অংশের অন্যান্য জনগণের অধিকার সমূহ আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সংবিধানটি দেশের বহুজাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে আরো দূরে সরে পড়ে।

রাষ্ট্র যদি ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকে তাই নিশ্চয় হবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তি, যেহেতু বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশ। তবে হ্যাঁ, দেশের নব্বই শতাংশের বেশী লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে ও আশি শতাংশের বেশী মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। স্বভাবতই সেই সংখ্যাগুরু ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষি জনগণের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন সংবিধানে স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু একই সময়ে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী ও সংখ্যালঘু ভাষাভাষি জনগণের ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য যদি পাশাপাশি কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণীত না হয় তাহলে সেদেশে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের পরিবর্তে সংখ্যাগুরুর স্বৈচ্ছাচারতন্ত্র বা Tyranny of the Majority ও আসতে পারে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার সবকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যদি সংখ্যাগুরুরাই অধিষ্ঠিত থাকে। কাজেই জাতিভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার পর ‘জাতীয়তাবাদী’ কার্যক্রমের মধ্যে তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক তফাৎ মনে রাখা দরকার। কারণ এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী রাজনীতিরও চর্চা হতে পারে। যে সেরকম অবস্থা দেশে একেবারে

চলে এসেছে এরকম ভাববার কোন কারণ নেই। তবে এটাও সত্য যে সাম্প্রতিকালে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে গর্বের চাইতে কলংকেরই কথা বেশী মনে পড়ে।

আদিবাসী অধিকার ও ঔপনিবেশীকতা :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের চাইতেও করুন। আমিবাসীরা একদিকে যেমন সংখ্যালঘু হিসেবে জাতিগত বৈষম্যের শিকার অণ্যদিকে তারা তাদের আদিবাসী বা তথাকথিত 'উপজাতীয়' সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহের জন্য অন্যান্যভাবেও বৈষম্য ও প্রভেদের শিকার হয়। এর জন্যেই কেবল 'সংখ্যালঘু' হিসেবে আদিবাসী জাতিসত্তাদের মৌলিক অধিকার ও স্বকীয়তা রক্ষা হচ্ছিল না বলেই কেবল আদিবাসীদের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং ১৯৯৩-কে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ এবং ১৯৯৪-২০০৩ সালকে আদিবাসী দশক হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। Declaration on the Rights of Indigenous Peoples নামক ঘোষণাপত্রে একটি খসড়া ১৯৮২ সাল থেকে প্রক্রিয়াগত রয়েছে এবং বর্তমানে জাতিসংঘে মানবাধিকার কমিশন দ্বারা বিবেচিত হচ্ছে। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ ঘোষণাপত্রটি অপরিবর্তিতভাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হবে। উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে শুরু করে তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

আদিবাসীদের মানবাধিকারের প্রশ্নটি আলোচনার সময় যখন আলাপ করছি তখন বোধহয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে আদিবাসীদের মানবাধিকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের চাইতে ভিন্ন কিছু নয়। আদিবাসীদের মানবাধিকারের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার। তবে, আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থা কিন্তু অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগণের বা সমাজের অন্যান্য অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত অংশের চাইতে ভিন্ন। এটার মূল কারণ হলো এ মহাদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ যখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ দ্বারা বিভিন্ন উপনিবেশসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আদিবাসীদের মূলতঃ জীবিকা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমূহকে (Subsistence economy) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও সচেতনভাবে বাজার অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং একইভাবে আদিবাসী জাতিসত্তাদের শাসন ব্যবস্থাসমূহকেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোতে কৃত্রিমভাবে আত্মিকরণ করা হয়। বলা বহুল্য এই প্রক্রিয়ার ফলে অনেক আদিবাসী জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৯৪৭ সনে বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা এ উপমহাদেশের শাসন কাজ থেকে প্রস্থান করলেও আদিবাসী অঞ্চলসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজও পর্যন্ত সেই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর রেশ দেখা যায়। পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামে বিগত দুই দশক সময়ে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘর্ষের অবস্থা সেই ঐতিহাসিকভাবে অধিকার বঞ্চনার ফলশ্রুতিতেই সৃষ্টি হয়েছিল বলে বুঝে নিতে হবে।

বাধা বিপত্তি :

আদিবাসীদের স্বকীয়তা ও মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রস্তাব আসলে অনেক সময় তাকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে নাকচ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অনেক সময় আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামকে “বিচ্ছিন্নতাবাদ” বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে তাদেরকে “বিচ্ছিন্ন”ভাবে রেখেছে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা আদিবাসীদের স্বকীয়তার অস্বীকৃতির মনোভাব। আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি চায়, এর অর্থ হলো তারা নিজেদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে জাতীয় মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে নয়। কাজেই আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ না দিয়ে বরঞ্চ বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিহত করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বহুদিন ধরে তাদের অঞ্চলের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার স্বীকৃতি দাবী করে আসছে। এটা মনে রাখা দরকার যে তারা নতুন কিছু চাচ্ছে না। ১৯৬৪ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ‘উপজাতীয় এলাকা’ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এর আগে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধান বলবৎ থাকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ‘Excluded Area’ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মাভি বা গারো অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহও ‘Excluded Area’ হিসেবে সে সময় চিহ্নিত ছিল। ‘Excluded Area’ বা ‘Tribal Area’ মর্যাদার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সে অঞ্চলের বিশেষ শাসন ও আইন ব্যবস্থা থাকা, যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আইন ও শাসন ব্যবস্থার সাথে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও সেই অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকা।

আবার আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা অনেকে অগ্রাহ্য করেন এই কারণে যে আদিবাসীদের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫%-এরও কম। কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, মিজোরামের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার ১%-র দশভাগের মত হলেও মিজোরামকে প্রাদেশিক মর্যাদা দিয়ে মিজোদের স্বকীয়তাকে ভারতের সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ পঞ্চাশ বছর আগে মিজোরামের মর্যাদাও ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় একটি জেলার। তদ্রূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক আদিবাসী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রকৃতি:

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিভিন্ন অর্থে হতে পারে। এখানে আমি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত একটি অর্থে সাংবিধানিক স্বীকৃতির মানে হলো আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার সাথে সাথে সেই জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আইন, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণের ও বিকাশের যথাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী, শিশু ও সমাজের অন্যান্য অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত অংশের জন্য যে রকম বিশেষ ব্যবস্থা আছে আদিবাসীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অধিকার ও স্বকীয়তা রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দেওয়া। এই স্বীকৃতিকে আরও ব্যাখ্যা করলে আমরা তিন রকমের

অর্থ পাই। স্বীকৃতির একটি অর্থ হলো রাষ্ট্রকে এইভাবে চিহ্নিত জনগণের Positive Discrimination বা Affirmative Action এর মাধ্যমে চাকুরী, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইত্যাদির Quota ব্যবস্থা নেওয়া। অধিকন্তু এই স্বীকৃতির দ্বিতীয় অর্থ হলো এই অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়াটা যাতে জাতিগত বৈষম্য হিসেবে আদালতে বে-আইনি ঘোষিত না হয়। সাংবিধানিক স্বীকৃতির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো, আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লেখ থাকা মানে তা জাতীয় সংসদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি ব্যাভীত পরিবর্তন করা যাবে না। তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৬২ সনের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ পাকিস্তানের অন্যান্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহকে ২২৩ নং অনুচ্ছেদে “উপজাতি এলাকা” হিসাবে চিহ্নিত ছিলো এবং ঐ অনুচ্ছেদে এরূপ উল্লেখ ছিলো যে, উল্লিখিত এলাকার জনমত যাচাই না করে সেই এলাকাকে উপজাতি এলাকার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। কিন্তু আসলে ১৯৬৪ সালের ১নং সংশোধনীর বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমত যাচাই না করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম “উপজাতি এলাকা” -এর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য কোন সংবিধান সাংবিধানিক সংস্কার আনা হলে আদিবাসীদের জনমতের বিরুদ্ধে যাতে সেই বিধানসমূহ সংশোধিত বা বাতিল না হয় তার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবে আদিবাসীদের সম্মতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা উচিত, তাদের মতামত গ্রহন কেবল যথেষ্ট নয়, নচেৎ সেই ১৯৬৪ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিশ্রেক্ষিতে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে জাতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২৮ অনুচ্ছেদ “সমাজের অনগ্রসর অংশের” কথা উল্লেখ আছে এটাই কি উপরোক্ত আলোচনার দ্বিতীয় অর্থের আদিবাসী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মেটায় না? যেভাবেই আমরা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখি না কেন, উপরোক্ত প্রশ্নে হ্যাঁ উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত, সমাজের অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত অংশকে “অনগ্রসর” বর্তমানের গণতান্ত্রিক যুগে সোহাদ পূর্ণতো নয়ই, বরং অশ্রদ্ধাশীলও বটে। দ্বিতীয়ত, আদিবাসী জনগণের বিশেষ আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চয় অনগ্রসরতার নিদর্শন নয়, বরঞ্চ তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের নিদর্শন। সুতরাং সংবিধানের ১৪, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে “অনগ্রসর” শব্দকে “অধিকার বঞ্চিত” বা “সুযোগ বঞ্চিত” বা অন্য কোন শব্দ দ্বারা পরিবর্তিত রূপ দেয়া উচিত। এছাড়াও পূর্বে বর্ণিত সংস্কারের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের বিশেষ স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে।

উপরেউল্লিখিত উপায়ে দেশের আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা সংবিধানিকভাবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত স্বীকৃতি ছিলো। সুতরাং এটা নতুন কিছু নয়। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বৃটিশ আমল এবং মোঘল আমল ও তারও আগে বিশেষভাবেই শাসিত ছিলো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনেক সময় ভুল করে মনে করা হয় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল মোঘল আমলে মোঘলদের দ্বারা শাসিত ছিলো এবং বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বকসারের যুদ্ধের পর বাংলার নবাবীর হস্তান্তরের চুক্তিতে অর্ন্তভুক্ত হয়। আসলে তা হয়নি এবং বৃটিশ আমলেই প্রথম

পার্বত্যাঞ্চলকে পূর্ণাঙ্গ ঔপনিবেশে পরিণত করা হয়। এই অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্গত।
অঞ্চলসমূহের ন্যায় অন্য কোন দিন শাসিত ছিলো না। বর্তমানেও শাসিত হচ্ছে না।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে হবে।

(১) সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন (“আদিবাসী”)

প্রথমতঃ আমাদের সাংবিধানিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য যথাযোগ্য কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বাংলাদেশ সরকার ও দেশের সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মাধ্যমে সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা। এখানে আমাদের এও স্মরণ রাখার দরকার যে ১৯৯৩ সালে দেশের আদিবাসী জনগণ যখন সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ উদযাপন করি তখন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে অন্যান্যের মধ্যে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী করি এবং তখন আমাদের মাঝে ছিল জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের আদিবাসী নেতা, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী ও ছাত্র সমাজ। এই অনুষ্ঠানে শুধু আদিবাসী নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন অনেক সাংসদ, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীগণও ছিলেন। এছাড়া এও উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত আদিবর্ষ উদযাপনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (তৎকালে বিরোধী দলীয় নেত্রী) শুভেচ্ছা ও সমর্থনের বার্তা পাঠান এবং তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়েই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক চুক্তিনামায় (Convention No. 107 1957) বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর ও Vatification দেবে।

১৯৯৩-তে আমাদের স্লোগান ছিলো “এবার নয় উপজাতি, আমরা সবাই আদিবাসী”। এখানে স্মরণ করা দরকার “উপজাতি” শব্দটি থেকে উপনিবেশিক ও প্রভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করা যায় না। আমি ভাষাবিদ নই। তবে আমার জানামতে ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা এই উপমহাদেশে আসার পরই ইংরেজী Tribal শব্দের অবলম্বনে বাংলায় “উপজাতি” শব্দটি প্রচলন শুরু হয়। তাছাড়া আমার জানামতে কোন আদিবাসী ভাষায় “উপজাতি” শব্দটি বিদ্যমান নয় এবং আমরা তথাকথিত Tribal Peoples আর অন্যান্য Peoples -দের মধ্যে কোনরকমের প্রভেদ করি না। এর সাথে সাথে আদিবাসী বা Indigenous পরিচয়ের ব্যাপারে মনে রাখা দরকার যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার Convention সমূহ থেকে Draft Declaration পর্যন্ত On the Rights of Indigenous Peoples -কেই আদিবাসী পরিচয়ের মূল নির্ধারক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে তথা সমতল ভূমির প্রজাসত্ত্ব আইন (SAT. 1950) এর ৯৭ ধারায় সুস্পষ্টভাবে আদিবাসীদেরকে (aboriginal) বা আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ শাসনবিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথিপত্র ও এমনকি জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আমরা ১৯৯৩ সনের আদিবাসী বর্ষ

উদযাপনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছাও সমর্থনের বাণীর কথা স্মরণ করতে পারি। সেই সমর্থন আমাদের জন্য এখন আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

২) সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য জাতীয় ঐক্যমত :

উপরোক্ত সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করতে গেলে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন লাগবে ও জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন। কাজেই আমাদের প্রয়োজন হবে দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সকল স্তরের বুদ্ধিজীবী, civil society, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী ও সকল স্তরের জনগণের সমর্থন চাওয়া। আমাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে সংবিধানের মূল কাঠামোকে আঘাত দেয়া হবে না বরং বাংলাদেশের বহুজাতিক ও বহু-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। তাছাড়া আমাদের এটাও সবাইকে বোঝাতে হবে যে আদিবাসীদের অধিকার আদায় সংখ্যাগুরু বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকারকে খর্ব করে আদায় করা হবে না। দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু অধিকারের নিশ্চয় কোন সীমাবদ্ধতা থাকার কথা নেই। সর্বোপরি আমাদের আরোও যথার্থভাবে বোঝাতে হবে যে সংবিধানে আমাদের পরিচয় যদি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করতে পারি, তখনই আমরা আরও যথার্থভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারবো। কারণ তখন আর আমরা কোনঠাসা ভাবে প্রান্তিক অবস্থায় থাকবো না।

৩) সাংবিধানিক আইনের যথার্থ প্রয়োগ

বলা বাহুল্য, সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েও তার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার আনতে না পারলে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায় আদিবাসীদেরও অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংবিধানে ও অন্যান্য আইনে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কার্যকর করা হয় না কারণ, সে আইনের যথাযথ প্রয়োগে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধিচার অভাব থাকে অথবা প্রয়োজনীয় কাঠামোর অভাব। উদাহরণ স্বরূপ সরকারী বা অন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সুরাহা পাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল বা বোর্ড (যথা- Race Discrimination Board) সৃষ্টি করা যেতে পারে। তদুপরি সকল আদিবাসীদেরকে চাকুরী ও শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। এর সাথে বাংলাদেশের দলবিধিতে Racism/communalism বা জাতিগত হিংসাকে আইনত দণ্ডনীয় করা হয়েছে অথচ এই আইন কোনদিনও প্রয়োগ হয় না। এছাড়া, অন্যান্যে মধ্যে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথা আদিবাসী সংস্কৃতি ও আদিবাসী ভূমিসত্ত্বের ব্যাপারে বিশেষ নজরের প্রয়োজন। আদিবাসী জাতিসত্ত্বার সংস্কৃতির যথার্থ বিবরণ যাতে জাতীয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয় তাও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

সর্বশেষে আদিবাসীদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, আদিবাসীদের ভূমি বেদখলের মামলা নিষ্পত্তির জন্যে বিশেষ Tribunal বা কমিশনের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও আইনজীবীদের সাহায্য ব্যতীত

সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের সমষ্টিগত ভূমি অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের যৌথ সাধারণ মালিকানাধীন গ্রামীণ বন, জুমভূমি, গোচারনভূমি, শ্রাশান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংরক্ষণের ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধিকারের কথা ILO Convention 107 -এর ১৩ নং অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি রয়েছে অথচ কার্যকর করা হয়নি।

এই সমস্যাটি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে যে আমাদের আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ও দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই কেবল সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য দাবী জানালে হবে না, বরং বর্তমান আইনের অধীনে স্বীকৃত অধিকার সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যেও আমাদের সমান নজর দিতে হবে। তবে, সার্বিক দিকে থেকে বিবেচনা করলে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়া আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারবে না।

মঙ্গল সূত্র : অনন্য জীবন বিধান

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, অধ্যক্ষ, আনন্দ বিহার ।

উন্নতি মানুষের সহজাত প্রত্যাশা । এ উন্নতি বস্তুতঃ দ্বিবিধ । জাগতিক তথা মৌলিক উন্নতি আর লোকোত্তর উন্নতি । পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জাগতিক উন্নতির দিকে আঁখি নিবেদিত । মানুষ হতে চায় জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির অধীশ্বর । হতে চায় ধনী, জ্ঞানী ও মানী । হতে চায় যশস্বী, খ্যাতিমান ও কীর্তিমান । আবার কেউ কেউ হতে চায় ভোগ লিন্সু ইন্দ্রিয় সর্বস্ব মানব মানবী রূপে উন্নীত হতে । মানুষের এ চাওয়া পাওয়ার কোন সীমা পরিসীমা নেই । আবার কেউ কেউ স্বর্গ মোক্ষ ও নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষায় নিজের যথা সর্বস্ব ত্যাগ করার সদিচ্ছা ও পোষন করে না তা নয় । এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরন দূর অতীত থেকে বর্তমান কালে ও দীপ্যমান বস্তুতঃ সদাসৎ কর্মের বদৌলতে মানুষ সব কিছুই লাভ করতে সক্ষম । ব্রহ্মলোক, ষড়্‌স্বর্গ থেকে শুরু করে বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ্যলোকে জন্ম ও অসুর, তিষ্যগ, প্রেতযোনি থেকে শুরু করে একেবারে অবীচি নরক পর্যন্ত অধোগমন মানুষের সদাসৎ কর্মের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তাই করুনাময় বুদ্ধ দ্বিবিধ দ্বারে কৃত মানুষের সদাসৎ কর্ম সমূহকেই তাদের ভাবী জন্মের ভিত্তি রূপে নির্ধারণ করেছেন ।

কর্মস্রোত অনেকটা প্রবহমান নদীর মতো । এ ক্রম বহমান কর্মস্রোত যতক্ষন না পর্যন্ত নিরুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষন তথা ততকাল পর্যন্ত ত্রিপিটকে বর্ণিত একত্রিশ শোক ভূমিতে কর্মানুরূপ গতি বা বিচরন অবধারিত । কর্মের এ সর্বকালীন স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে করুনাময় বুদ্ধ ‘দস ধম্ম সুত্তে’ বলেছেন- “কম্ম সসকোহিম, কম্ম দায়াদো, কম্ম যোনি, কম্ম বন্ধু, কম্ম পটিসরনো- যং কম্মং করিসসামি কল্যানং বা পাপকং বা তম্ম দায়াদো ভাবিসসামীতি ।” কর্মই আমার অনন্য সুহৃদ, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী, কর্মই আমার বন্ধু, কর্মই আমার একমাত্র আশ্রয়, কর্মই আমার গতি নির্ধারণ করবে । কল্যাণকর বা পাপ পঙ্কিল যে কর্মই আমার দ্বারা ইহ জন্মে সম্পাদিত হবে তারই একমাত্র উত্তরাধিকারী আমাকেই হতে হবে । এর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না ।

আমার আলোচ্য বিষয় মঙ্গল সূত্রঃ অনন্য জীবন বিধান । করুনাময় বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত মঙ্গল সূত্রে পর্যায় ক্রমিকভাবে সুবিশ্লেষিত আটত্রিশটি মঙ্গল ময় কর্মের ওপর ভিত্তি করে মানুষ কিভাবে ইহ পরলৌকিক যথার্থ মঙ্গল ময় জীবন বিধান সুন্দর রূপে স্থিরীকৃত করতে পারবে তারই স্বরূপ অধিতীয় পূর্বশর্ত । এতে আমার মৌলিকত্ব দাবীর কোন অবকাশ নেই । শুধু করুনাময় বুদ্ধদেশিত আটত্রিশটি মঙ্গল ময় কর্মের বা বানীরই চর্চিত চর্বন এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেলুম ।

১. মূর্খের সেবা না করা উত্তম মঙ্গল বুদ্ধের ভাষায় মূর্খের অপর নাম মোঘ, পুরুষ অজ্ঞ অবিবেচক, হঠকারী স্থূলদর্শিতা প্রভৃতি মূর্খের সমার্থ বাচক শব্দ । সুতরাং একজন মূর্খ, হঠকারী বৈকল্যচিন্তা ব্যক্তির সেবা করলে সদৃগতির পরিবর্তে নরকের দ্বারই যে উন্মুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তা প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের ভেবে দেখা উচিত এবং মূর্খের সেবা কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য ।

২. জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা কর্ম সু সম্পাদন উত্তম মঙ্গল। যার বুদ্ধিমত্তা, দী শক্তি, বোধবুদ্ধি, সুস্বদর্শিতা, বিবেচনা শক্তি ও বিচার শক্তি রয়েছে তাঁকেই সচরাচর জ্ঞানী হিসেবে আখ্যা দান করা হয়। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা, জ্ঞানীর সান্নিধ্য লাভ, জ্ঞানীর সাহচর্য ইহ পারলৌকিক সদগতির ও সার্বিক মঙ্গল দর্শনের অবধারিত পূর্বশর্ত বিধায় করুণাময় বুদ্ধ ও ধুমাএ জ্ঞানী লোকদের সেবা কর্ম সম্পাদনকেই উত্তম মঙ্গল হিসেবে বিধান দিয়েছেন।

৩. পূজনীয় ব্যক্তিগণের নৈমিত্তিক পূজা কর্ম সুসম্পাদন উত্তম মঙ্গল রূপে বিবেচিত। জ্ঞানী ও পূজনীয় ব্যক্তিবর্গের সময়োচিত পূজা সৎকার এবং সম্মান প্রদর্শন সভ্য জাতি ও সমাজের একটি অনন্য উত্তরাধিকার এবং এরূপ সভ্য-প্রতিশ্রুতিশীল সমাজেই প্রাতঃ স্মরণীয় ও বরণীয় জ্ঞানী পন্ডিতের জন্ম সম্ভব। অতএব এটি ও ব্যক্তি ও সমষ্টির অনন্য জীবন বিধান রচনার অদ্বিতীয় মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত।

৪. প্রতিরূপ দেশে বাস করা ধর্মত জীবন যাপনোপযোগী দেশে বাস করা ও উত্তম মঙ্গল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মঙ্গল সূত্রে। বস্তুত এখানে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধনোপযোগী দেশ অথবা পরিবেশকেই প্রতিরূপ বা অনুকূল পরিবেশ হিসেবে মূল্যায়ণ করা হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এরূপ পরিশীলিত ধ্যানানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব সচেতন সমাজ মানসেরই ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার। অনুরূপ মঙ্গল সূত্রের নিম্নোক্ত মঙ্গলময় কর্ম সমূহকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে সাজানো যেতে করে।

৫. পূর্বকৃত পূন্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা উত্তম মঙ্গল।

৬. নিজেকে সঠিক পথে বা সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঙ্গল।

৭. নানা শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানার্জন উত্তম মঙ্গল।

৮. ববিধ শিল্প তথা কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়া উত্তম মঙ্গল।

৯. বিনয়ী হওয়া।

১০. সুশিক্ষিত হওয়া।

১১. সুভাষিত বাক্য বলা।

১২. মাতা-পিতার যথোপযুক্ত সেবা যত্ন করা।

১৩. স্ত্রী পুত্রের উপকার সাধন ও ভরন পোষন

১৪. নিষ্পাপ ব্যবস্যা বানিজ্যের মধ্যদিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা।

১৫. যথাকালে দান দেয়া।

১৬. যথোপযুক্ত সময়ে ধর্মচারন,

১৭. জাতী বর্গের যথার্থ হিত সাধন,

১৮. সদ্ধর্মে অপ্রমত্ত ও অবিচলিত থাকা,

১৯. কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি সুসংরক্ষন,

২০. শারীরিক ও মানসিক পাপ কর্মানুষ্ঠান বিরতি,

২১. মাদকদ্রব্য সেবনে যথার্থ সংযমতাবলম্বন,

২২. অপ্রমত্তভাবে যাবতীয় পূণ্যকর্ম সুসম্পাদন,

২৩. গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব প্রদর্শন,

২৪. গৌরবনীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি যথার্থ বিনয় প্রদর্শন,

২৫. যথালব্ধ বস্তু ও বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা,

২৬. উপকারীর প্রত্যুপকার স্বীকার,

২৭. যথাসময়ে সঙ্কর্ম শ্রবণ,
২৮. ক্ষমা শিলতা,
২৯. সুবাহ্যতা,
৩০. যথারীতি শীল গুণবিমন্ডিত ভিক্ষু শ্রমণ দর্শন,
৩১. যথাসময়ে ধর্মালোচনা,
৩২. যথোপযুক্ত সময়ে তপস্চর্যা,
৩৩. যথোপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মচর্যাবলম্বন,
৩৪. যথার্থভাবে চতুরার্য্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম,
৩৫. সর্বদুঃখ অন্তসাধনকর পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যে সদা তৎপর থাকা,
৩৬. লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুঃখ এ অষ্টলোক ধর্মে
অবিচলিত থাকা,
৩৭. শোকহীনতা ও
৩৮. লোভ-দ্বेष-মোহরূপ অগ্নি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিষ্কলুষ অবস্থান উত্তম
মঙ্গল ।

এখানে মুর্থ বা অজ্ঞানী ব্যক্তির সেবা-পূজা না করা থেকে শুরু করে লোভ-দ্বেষ ও মোহ রূপ অগ্নি থেকে নিরাপদ দূরত্বে বজায় রাখা পর্যন্ত আটত্রিশটি উত্তম মঙ্গলময় কর্মানুষ্ঠানের কথা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল। বলে রাখা ভাল- প্রতিটি মুদ্রিত ধর্মীয় পুস্তকে তথা সঙ্কর্ম রত্নাকর সঙ্কর্ম রত্নমারা, সঙ্কর্ম রত্ন চৈত্যা প্রভৃতি আরও অনেক মুদ্রিত সূত্র সম্বলিত পুস্তকে বঙ্গানুবাদ সহ মঙ্গল সূত্র সম্বন্ধে মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়। তবুও কেন মঙ্গল সূত্রের এ ব্যাখ্যা? তদুত্তরে সুধী জনের সমীপে শুধু এটুকুই আমি বলতে চাই বর্তমান এ দ্বন্দ-বিষ্ফুর্ক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় কবলিত সমাজে করুনাময় তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত মঙ্গল সূত্রের আটত্রিশটি সর্বোত্তম মঙ্গলময় বানীর আলোচনা, পর্যালোচনা ও অনতিবিলম্বে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রয়োগ অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে বিধায় আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। কারণ এটি নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে মঙ্গলসূত্রে বর্ণিত আটত্রিশটি মঙ্গলময় কর্মানুষ্ঠানের আলোকে সুষ্ঠু সুন্দর ও সুশীল সমাজ বিনির্মান সম্ভব। সর্বোপরি ইহ পারলৌকিক সদগতির অনন্য জীবন বিধান ও এর মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে।

“সবাই গেছে বনে”

“বনে চল যাই”

ভগদত্ত খীসা

আফশোষ- স্থানীয় অরণ্য সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। তাকে আর ধরে রাখা গেল না। আধুনিকতার এবং তথাকথিত সভ্যতার সদৃশ পদচারণা উত্তরোত্তর গ্রাস করে ফেলছে তাকে। শৈশবে বা কৈশোরে অরণ্য সংস্কৃতির যা কিছু ছিটে ফোঁটা দেখেছি। সেই সংস্কৃতির সুনিবিড় ছায়ায় আমরন অবগাহন করা আর আমার হল না। কাকস্নান সমাপন করে ক্ষান্ত দিতে হয়েছে। তাতে ভৃগু কোথায়?

ভরা যৌবনের কোন এক সময় গহন অরন্যে হারিয়ে যাওয়া উপজাতীয় প্রবনতা। হেমন্তের শেষে বা শীতের শুরুতে জুমের ফসল শেষ হয়ে যায়। তিল-তুলা আহরন শেষ। সবজী-খেত ও শীতের কৃষ্ণতায় ধূসর। হাতে আর কাজ থাকে না। অরণ্যের হাতছানিতে তরুনরা তখন পা বাড়ায় কাসাং বা মাইনীর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। রথদেখা-কলাবেচা দুটোই সমাধা হয়।

বনে বিপুল বাঁশের ঝাড়। শত বছর ধরে সংরক্ষিত এই ঝাড়ে মোটা মোটা বাঁশ। ফাঁপা বাঁশের চোঙায় হাত ঢুকে যায় প্রায়। কিছু বাঁশ কেটে ভেলা বেঁধে মাইনীমুখে নিয়ে এলে নগদ পয়সা। অন্যদিকে বনের নিত্য নতুন খাদ্য সম্ভারে মুখের স্বাদ ফিরানো যায়। বনে আবার বাঘ-হাতী-আর অজগর সাপের আস্তানা। তাদের মোকাবেলা করে তরুন বয়সের বাহাদুরী-সারাজীবন বয়ান করা যায় আসরে-আড্ডায়।

পাঁচ-সাত জন নিয়ে একটা দল তৈরী হয়। সঙ্গে রাখতে হয় অবশ্যই একজন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি- “কাবিদাং”। সেই-ই পথ প্রদর্শক। বনাঞ্চলের অন্ধি-সন্ধি সব তাঁর জানা। বিপদে-আপদে সেই একমাত্র ভরসা।

একটা নৌকা ভাড়া করে প্রথমে যেতে হয় কাসাং বেয়ে মাইনীমুখ। সেখানে ফরেস্ট অফিস। বনে ঢুকবার ‘পাস’ বা অনুমতি নিতে হয় এখান থেকে। তারপর উজান বেয়ে চলে যাও যার যেখানে খুশী- সিঁজক, গঙ্গারাম, বাঘাইহাট। নৌকায় থাকে মাস খানেকের খোরকী। চাল, লবন, তেল মশলাপাতি, কেরোসিন বাঁশের হুকো-কলকী-তামাক-বিড়ি দেয়াশলাই। বন এলাকায় মাছ ধরার জাল নিতে গেলে ট্যান্স লাগে। শিকারের জন্য বন্দুক রাখা নিষিদ্ধ। অনেকে গোপনে নিয়ে যায়। বাঘ-হাতীর কবল থেকে আত্মরক্ষা হয়। আবার শিকার করে খাবারের মজাটাও ষোল আনা পাওয়া যায়।

শীতের শুকনা শীর্ন-নদী। নৌকা বেয়ে উজান যেতে কয়েকদিন লাগে। দিনের বেশা বাঘের ভয় নেই। তবে পথে হাতির পাল পড়লে দারুন মুসকিল। অনেক সময় হাতির মামন করতে নদীতে নামে। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা জলকেলি করে। এই সময় অপেক্ষা করতে হয়,

গতক্ষণ তারা সরে না যায়। ‘কাবিদাং’ থাকে সতর্ক। কোন কথা নয়। চূপচাপ! হুকো টানাও শব্দ। ওরা শুনে পায়। ধোঁয়ার স্থান পায় দূর থেকে।

নদী পথে যেকানে রাত, সেখানে কাত। দেখে শুনে স্থান নির্বাচন করতে হয়। নদীর পাড় যেখানে খাড়া, শুকনা নদী তীরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা। খাড়া পাহাড় বেয়ে বুনো জন্তু আসতে পারে না। সন্ধ্যার আগে খাওয়ার পর্ব শেষ করে নিতে হয়। বালুকাভূমিতে গর্ত খুঁড়ে আপাদ-মস্তক গিলাপ জড়িয়ে শুতে হয়। না হলে মশা, আর ছোট্ট পোকা ‘পুকি’ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সর্বাস্ত্র ছেঁদা করে দেবে। ঘুমে-নির্ঘুমে প্রহর কেটে যায়। বুনো-পোকারা সন্ধ্যা থেকে নহবৎ বাজায়। সামান্য বাতাসে পাতা ঝরে যায় নিবিড় বনে। শব্দ হয় সর-সরর। গাছে তক্ষক ডাকে। পেঁচার তুলে হুঙ্কার। গেছো ব্যাঙ-কাগ ব্যাঙ ডাকে থেকে থেকে। গাছের শাখায় পাখীরা প্রহরে প্রহরে ডানা ঝাপটায়। বানরগুলো থেকে থেকে কিচির মিচির করে। রাত একটু গভীর হলে শোনা যায় বাঘের ডাক কিংবা হাতির বৃংহন। এভাবে রাত শেষ হয়।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মুরু হয় বাঁশ কাটা। কাবিদাং থাকে সদা সতর্ক। বাঁশ বয়ে এনে জড় করা হয় নদীর তীরে। গোলাক বা কেরেরত বেত দিয়ে বাঁধা হয় ডেলা। একটার পিছে আর একটা।

কর্মময় দিনের ফাঁকে ফাঁকে কত কথা তার শেষ নেই। কিন্তু অশ্লীল বাক্য বা খারাপ বলা যাবে না। এখানে একটা ‘সত্য’ আছে। নচেৎ বাঘ এসে হানা দেবে। বাঘের হাতে মৃত্যুও হতে পারে। লোকে বলে গঙ্গারামে সাদা বাঘ আছে। তারা বাঘ নয় দেবতা।

সকাল দুপুর সন্ধ্যায় খানা পিনার শেষ নেই এখানে। কচ্ছপ পাওয়া যায় নদীর পাড়ে। কপাল ভাল হলে বালুচরে ডিমও পাওয়া যেতে পারে। কমসে কম দু-তিনশ ডিমপাড়ে একটা কচ্ছপ। কচ্ছপের পায়ের দাগ দেখে কাবিদাং বুঝতে পারে কতদূরে মাটির নীচে পাওয়া যাবে এই ডিম। সিদ্ধ কর আর প্রানখুলে খাও। গোসাপও পাওয়া যায় ভাগ্যশুনে।

গাছে পাওয়া যায় মৌচাক। মধু আর কত খাবে? নরম মৌচাক মধুতে ভর্তি। তাই চিবাতে চিবাতে গলা ধরে আছে। আর কচি কচি মৌ-পোকাকগুলো ভেজে খাওয়া যায়।

বন্দুক থাকলে সম্বর-হরিন শিকার করা যায়। অবশ্য তা বে-আইনী। বনের কোন কোন জায়গা স্যাস্যাতে-লবনাক্ত। দলবেধে বুনো জন্তুরা সেই লবন খেতে আসে। সুযোগ মত হরিন সম্বর শুওর মেরে নিলেই হল। ভাজা-পোড়া-সেঁকা-রান্না করা মাংস চিবুতে চিবুতে মাড়িতে ব্যথা ধরে যায়।

জলা জায়গায় পাওয়া যায় বুড়ো আঙ্গুল সাইজের ব্যাঙাচি। মশলা সহযোগে পাতায় জড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিলে উমদা খাবার। কি তার সুস্থান!

সুফটিক স্বাছ নদীর জলে ঝাঁক বেঁধে দূরে বেড়ায় মাছ। সঙ্গে আনা খ্যাপলা জাল মারলে, মাছের ভারে জাল ছিঁড়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

নদীর জল যেকানে গভীর, ১০/১৫ হাত নীচুতে থাকে থাকে পাথরের খাঁজ। ওখানে শুয়ে থাকে বাঘাই মাছ। এক একটা কমসে কম ত্রিশ-পয়ত্রিশ সের। একটা বেঁত নিয়ে ডুব দেয় কাবিদাং। মাছের লেজে বেঁধে ফেলে গভীর পানিতে। তরপর হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে টেনে তুললেই হল। হয়ে গেল কয়েক দিনের খোরাক। বেতের কচি আগা, টাটকা নানা শাক দুবেলা খেয়ে পেট ভরে যায়। সঙ্গে আনা চাউলের ভাঁড়ারে আর হাত পড়েনা।

এমনি করে দিন যায়। সপ্তাহ শেষ হয়। মাস যায় যায়। শীত আরো রেড়ে যায়। কুয়াশা ঘন হয়ে আসে। কাজ আর খাওয়া। বাঁশ জমতে থাকে। ভেলা বানানো হয়। একটার পিছে আর একটা।

নিরিবিলা নিবিড় বনানীতে হঠাৎ একদিন বাঘের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। দুঃশপ্ন বেড়ে আসে। মনে পড়ে যায় ঘরের স্মৃতি। গ্রামের পরিবেশ। মা-বাবা ভাইবোন আর সব আত্মীয়ের কথা। ভোর হলে মন আর টিকে না।

এবার ঘরে ফিরতে হবে।

বাঁশের ভেলায় চড়ে, ভাঁটির টানে, চালি ঠেলে ওরা এগিয়ে যায় মাইনীমুখের দিকে। সেই সময় মাইনীমুখ ছিল প্রসিদ্ধ গাছ-বাঁশের ব্যবস্থাস্থল। সওদাগরেরা ওখানে অপেক্ষায় থাকে উজান থেকে কখন কাঠুরিয়ারা বাঁশ গাছ নিয়ে আসে। ফরেস্ট অফিসে যথারীতি ট্যাক্স জমা দিয়ে বাঁশ বিক্রী হয়। হিসাব করা হয় লাভ লোকসান। এই ক'দিনের খোরকী, নৌকার ভাড়া ইত্যাদি মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত সর্ব-সাকুল্যে থাকে কয়েকটা টাকা। এখানে টাকাটাই মুখ্য নয়। এই ক'দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেটাই মুখ্য।

ফি-বছর উপজাতীয় সমর্থ যুবকরা যায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে।

আমি গিয়েছিলাম ১৯৫১ সালে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর। মাইনী-কাচালং বনাঞ্চলে নয়- একেবারে বরকল পেরিয়ে ঠেঁগা ও লুসাই হিলে।

বরকল তখন দেখার মত জায়গা। এখানে কর্ণফুলি দুই পাহাড়ের ফাঁক গলে নেমেছে দ্রুত লয়ে। গ্রীষ্মে তার একরূপ। বর্ষায়-ভয়ঙ্কর। দিনরাত সেখানে কর্ণফুলি গজরায়। অঝোরে বয়ে চলে খরস্রোত।

দু'শ বছর আগে ইংরেজ বুকানন সাহেব বরকলের এই জায়গায় নৌকা উল্টিয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন। সে কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন আদ্যোপান্ত তার পুস্তকে।

সেই বরকল দেখতে গিয়েছিলেন রাজামাটি থেকে প্যাসেঞ্জার নৌকায় চড়ে। সারা রাত লগি ঠেলে নৌকার মাঝি ও নাইয়ারা আমাদের পৌঁচে দিয়েছিল বরকলে সকাল আটটায়।

আমার সঙ্গে ছিলেন সুরেশ্বর বাবু আর অভিজ্ঞ লোক বিজয়বাবু। ইচ্ছে ছিল, বরকল থেকে কিছু চাউল কিনে, রাস্কামাটি এনে বিক্রয় করব।

ওখানে গিয়ে শুনলাম, ঠেকায় চাউলের মন চার টাকা। অথচ রাস্কামাটিতে দামছিল চৌদ্দ টাকা মন। লাভের গরজে জগন্নাথ ছড়ার উজানে হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে, গুই/সুইছরির উপর দিয়ে ঠেগায় চলে গিয়েছিলাম। বায়না দিয়ে চাউল সংগ্রহ করতে সময় লেগেছিল তিন সপ্তাহ।

সেই চাউল বাঁশের ডেলায় তুলে ঠেগা ও কর্ণফুলির উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাই রাস্কামাটি। নিজেকে মনে হয়েছিল মার্ক টোয়েনের হাকলবারি ফিন।

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থাই বদলে গেছে। দুর্গম অঞ্চল আর কোথাও নেই সিজক, গঙ্গারাম আর বাঘাইহাট এখন হাতের কাছে। ডাঙায় বাস-ট্যাক্সি, জলে কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় আর নাব্য নদীতে লঞ্চ, মোটর বোট, ট্রলার-টেম্পু। নিবিড় বনাঞ্চলও আর কোথাও নেই। বাঘ হাতিরাও দেশান্তী হয়েছে।

যারা একবার বনে গেছে, বনচারী হয়েছে, হাজার ঘটনা দুর্ঘটনায় টান টান উত্তেজনা তাদের শিরায়-মজ্জায় সঞ্চিত হয়েছে, বৈঠক-মজলিশে সুযোগ পেলে সুদীর্ঘ বর্ণনায় আসর মাত করে রাখে।

জয়চন্দ্র গিংখুলী

শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

প্রত্যেক বছর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন, সংক্রান্তির দিন এবং নতুন বছরের পয়লা তারিখ - এই তিনদিন মিলে আমাদের বিষ্ণু বা বিষ্ণু উৎসব। ত্রিপুরাদের বৈসুক, মারমাদেং সাংখাইং ও চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষ্ণু বা বিষ্ণু শব্দগুলির সমন্বয়ে এখন “বৈসাবি” নামে আমরা এই উৎসব পালন করতে শুরু করেছি। মুখ্যতঃ এই চারি সম্প্রদায়ের উৎসব বৈসাবি হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রায় সবাই এতদুপলক্ষে কোন না কোন উৎসবে মেতে ওঠে।

বৃটিশ আমলে এই উৎসব দীর্ঘ কয়েকদিন স্থায়ী হত। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে প্রায় স্বাধীনতা ছিল। পাকিস্তান আমল হতে তা ক্ষুন্ন হতে থাকে। ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে না হলেও কৃষ্টি ঐতিহ্যের ধারক এই উৎসব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও অবশ্যই পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য আদিবাসীদের যে অধিকার আদায় হয়েছে তাতে স্বকীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি চর্চা ও উন্নয়নের স্বাধিকারও অর্জিত হয়েছে। পার্বত্য আদিবাসীদের সকলের মনে শান্তি ফিরে এসেছে। মনে স্বস্তি থাকলে সাধারণতঃ সুখময় স্মৃতির কথা মনে বার বার জাগে। বিশেষতঃ যেই উপলক্ষে সুখোৎপত্তির কারণে আনন্দময় ঘটনা ঘটে, সেই উপলক্ষেই অধিকভাবে সেই স্মৃতির কথা বার বার মনে জাগে। বিষ্ণু বা বিষ্ণু তঞ্চঙ্গ্যা একটি উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ। বিষ্ণু উপলক্ষে এখন পূর্বদিনের সুখময় স্মৃতির কথা বার বার মনে আবির্ভূত হচ্ছে।

বৈসাবি বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে পালন করে থাকেন। তিনদিন ব্যাপী যে আনন্দ উল্লাস হৈছে হয় তা বলা বাহুল্যমাত্র। এই সময়ে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে - ফুল দিয়ে গৃহ সাজানো, নদীতে ফুল ভাসানো, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অতিথি অভ্যাগতদের জন্য উদারভাবে বিভিন্ন রকমের পিঠা, মিষ্টি, ফলমূল বিতরণ, ক্যাঙে বুদ্ধমূর্তিস্নান, বুদ্ধ পূজা, ভিক্ষু সংঘকে সোয়াইং বা পিন্ডদান এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধাও মৈত্রী জ্ঞাপন অপরিহার্য। এতদসঙ্গে যুবক যুবতীদের মধ্যে ঘিলা খেলা অনুষ্ঠান এবং গিংখুলী গীতের আসর এই উৎসবকে পরিপূর্ণতায় ভরে তোলে। চাকমা সমাজেও এইভাবে এই উৎসব পালিত হয়। মূলত চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বেলায় এই উৎসব একই রকম বলা চলে। ঘিরা খেলা, নাথেং খেলা এবং গিংখুলী উভয় সমাজে এক রাখীবন্ধন সৃষ্টি করেছে এবং অভিন্ন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির জন্মদান করেছে। বৃটিশ আমলে এই অনুষ্ঠানগুলি বেশ কয়েকদিন ধরে স্থায়ী হত।

চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের বীরত্বমূলক ঐতিহাসিক কাহিনীসম্বলিত ধনপুদি রাধামন পালা, চাদিগাংছাড়া পালা, বিভিন্ন বারমাসী - যথা; চান্দোবী বারমাস, তান্যাবি বারমাস ইত্যাদি লোকগীতিই হচ্ছে গিংখুলীদের গানের বিষয়বস্তু, এই সমস্ত পালাগান অবিরত গেয়ে গেয়ে এই চারন কবি গিংখুলীরা চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ, বীরত্ববোধ এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক চেতনা জাগিয়ে তুলত।

যতদূর জানা যায়, তঞ্চঙ্গ্যা গিংখুলীদের মধ্যে জয়চন্দ্র (কানা গিংখুলী), কালমন, বংশী, পংচান, শাচীঅং, রুশীঅং, দুমপ্র, বীর, কিরণ, ভাগ্য কুমার, বিচকধন, গরাচান, কক্সিলা - খুবই বিখ্যাত ছিলেন। জয়চন্দ্র গিংখুলী তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে একজন কিংবদন্তীর পুরুষ। তিনি অন্ধ বিধায় “কানা গিংখুলী” নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম রাঙ্গামাটি জেলার সদর থানায় ১০৮ নং মানিকছড়ি মৌজার রেইন্যাছড়িতে। চাকমা জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যমূলক রাধামন-ধনপুদি পালা, চাদিগাংছাড়া পালা তাঁর যাদুকরী কণ্ঠের অপূর্ব লহরীতে শ্রোতাগণ বিম্বয়াবিভূত হত। তাই তিনি শুধু তঞ্চঙ্গ্যা নয় চাকমা সমাজেও সমানভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন তিনি এবং চাকমা রাজ দরবারে তাঁর সমাদর ছিল প্রচুর। রাজকবি যাকে বলে, জয়চন্দ্র বা কানা গিংখুলী রাজ দরবারে ঠিক তাই ছিলেন। অন্যান্য গিংখুলীদের ন্যায় জয়চন্দ্র গিংখুলীও গানের জন্য এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় ভ্রমণ করতেন। বহু সচ্ছল গৃহস্থ তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গাঘাট বলতে তখন পায়ে চলার পথই একমাত্র পথ ছিল। নদীপথে আসা যাওয়ার উপায় ছিল না এমননহে। ছড়া নদী পার হতে হয় এবং চরাই উৎরাই উত্তীর্ণ হয়ে এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে পৌঁছতে হত। দুঃপাহাড় শীর্ষে অবস্থিত দুটি পল্লী হয়ত খুব কাছাকাছিই মনে হয়, লোকজন চিৎকার করলে উভয় পল্লীতেই অনায়াসে শোনা যায়, এক পল্লীর লোকজনের চলাফেরা অপর পল্লীর লোকদের চোখে স্পষ্ট পড়ে - কিন্তু এক পল্লী থেকে অপর পল্লীতে যেতে হলে তিন চার মাইল পথ উঠানামা করতে হয়। এই রকম দুর্গম পথে জয়চন্দ্র গিংখুলী কাঁধে বেহালা ও হাতে লাঠি নিয়ে একা এক পল্লী থেকে অপর পল্লীতে যেতেন বলে শোনা যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য সংগীও থাকে।

জয়চন্দ্র বা কানা গিংখুলী যেমন ছিলেন চারন গায়ক তেমনি রসিক, কৌতুকপ্রিয় এবং মানুষ হিসেবে খাঁটি ও ধর্মপ্রাণ। তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং ভবিতব্য বিপদ আপদের কথাও নাকি আঁচ করতে পারতেন। শোনাযায় ভবিষ্যতের কথা আঁচ করতে পেরে রাজা ভূবন মোহন রায়কে আর্থিক ক্ষতি থেকে একবার রক্ষা করেছিলেন। শোনা যায় তাঁর জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনাও ঘটেছিল। অনেক গিংখুলী তাঁর এসব গুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি ঈর্ষাবশত তাঁকে অপমান করার চেষ্টা করত। গানের প্রতিযোগিতায় নামলে সেইসব গিংখুলী - জয়চন্দ্র বা কানা গিংখুলীর মত চমকপ্রদ, চিত্তাকর্ষকভাবে গান গাইতে পারত না। আবোল তাবোল গান গেয়ে শ্রোতাদের কোপানলে পরে নিজেরাই অপমানিত হত।

বিষ্ণুর সপ্তাহখানেক পূর্বে একদিন তিনি দুমদুম্যা মৌজার এক পল্লী থেকে হেডম্যানের বাড়ীতে অপরাহ্ন বেলায় এক সংগীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথটি দুর্গম এবং গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেগেছে। কিয়দূর গিয়ে একটি পাহাড়ের রিজ ধরে হাঁটছিলেন তিনি সংগী লোকটির হাত ও তাঁর ধরা ছিল কেন না - রিজটি ছিল উৎরাই এবং উঁচুনীচু। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন উড়ন্ত মৌমাছির মৌ মৌ শব্দ। সংগী লোকটি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেন কোথায় চলে গেল। ঠিক সেই সময় মৌমাছির ঝাঁক এসে তাঁর মাথার ওপর সৌ সৌ শব্দ করতে করতে উড়তে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন সংগী লোকটি মৌমাছির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে ত্যাগ করে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন মৌমাছির আক্রমণের লক্ষ্য একমাত্র তিনি।

দু'একটা মৌমাছি তাঁর মাথায় চুলের উপরেও বসেছিল। তিনি আঁচ করলেন - এয়ে ষণ্দ। হয়ত কোন লোক কাছের কোন বৃক্ষে অবস্থিত মৌচাক ভেঙে নিয়ে গেছে মৌমাছিদের তাড়িয়ে। মৌমাছির বিতাড়িত হয়ে এখন শত্রুর সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়িয়ে পড়েছে। তিনি অন্ধ, নিরুপায় - কোথাও পালিয়ে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব এবং পালিয়ে গেলেও মৌমাছির আক্রমণে উন্মত্ত হয়ে অনুসরণ করবে, হল ফুটিয়ে জর্জরিত করবে। তিনি তখন ধীর গভীর ও আত্মস্থ হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন : “আমি জানি ইহা গভীর জঙ্গল। এখানে বড় বড় বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে সং দেবতা আছেন। আপনারা সাক্ষী হউন - আমি একজন নিরীহ অন্ধ ব্যক্তি, আমি কারও ক্ষতি করিনি। এই মৌমাছিদেরও আমি কোন ক্ষতি করিনি - অথচ আজ তারা আমাকে তাদের শত্রু মনে করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছে বা আক্রমণ করছে। আপনারা যদি সং দেবতা হন এবং আমি যদি সংলোক হই তাহলে আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। এই মৌমাছিদের ক্ষতি যদি আমি সত্যই করে থাকি - তাহলে তারা আমাকে বিনাশ করুক, আমার কোন দুঃখ নেই, আর যদি কোন ক্ষতি করে না থাকি তাহলে তারা আমাকে আক্রমণ না করে ফিরে চলে যাক। হে দেবতাগণ আমি আপনাদের মৈত্রী জ্ঞাপন করছি এবং এই মৌমাছিদেরও আমি মৈত্রী বিতরণ করছি।” আশ্চর্যের বিষয় মৌমাছির ঝাঁক আস্তে আস্তে সে স্থান ত্যাগ করল, তাঁকে আক্রমণ করেনি - একটি মৌমাছির হলও তাঁর শরীরে ফুটেনি। কিন্তু তাঁর সংগী পথের পন্থাদ দিকে ছুটে গিয়ে পাহাড় নেমে একটি ছড়ার কুয়ায় আশ্রয় নিলেও মৌমাছির দল তাকে আক্রমণ করে। অনেক পরে কাতরাতে কাতরাকে জয়চন্দ্র গিংখুলীর কাছে চলে আসে এবং দেখে গিংখুলীর কোন ক্ষতি হয়নি অথচ সে মনে করেছিল গিংখুলীর অবস্থা মৌমাছির আক্রমণে খুব সংগীন হয়েছিল। মৌমাছির তাঁকে মোটেই আক্রমণ করেনি - এই কথা তার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু গিংখুলীর সুস্থ অবস্থা দেখে বিস্ময়াপন্ন হয়ে গিংখুলীর নিকট ক্ষমা চায় সে।

জয়চন্দ্র বা কানা গিংখুলীর কথা আজও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শ্রদ্ধার সাথে আলোচিত হয়। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য গিংখুলীদের কথাও। অহো, তখন বিষুর কাছাকাছি তঞ্চঙ্গ্যা এবং চাকমা পাড়াতে বেহালার মধুর ঝংকার আর গিংখুলীদের অনিন্দ্য কণ্ঠের গানে চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা শ্রোতার বিস্ময়াবিমুক্ত চিত্তে স্বকীয় বীরত্ব, ঐতিহ্যমূলক - পালাগান শুনে অবিভূত হয়ে থাকত। সেই বেহালার ঝংকার, ঐতিহ্যমূলক গান আবার শুনতে চাই। বেহালা কাঁধে করে গিংখুলীদের পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ ভ্রমণ আবার দেখতে চাই। পার্বত্য আদিবাসী সকল জাতিসত্তার বীরত্ব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির মনমাতানো গান এবার শুনতে চাই। এবার গিংখুলীদের কণ্ঠে ঝঙ্কত হয়ে উঠুক পার্বত্য আদিবাসীদের স্বাধিকার অর্জনের গান, বাংলাদেশের সমৃদ্ধির গান, বেহালার সুমধুর সুরে সেই গান প্রতিধ্বনিত হোক পাহাড়ে পাহাড়ে। সেই সুর, সেই গান ঝঙ্কত হয়ে উঠুক সবার মিলিত কণ্ঠে, বিলু বা বিষুর দিনে এই কামনা।

ত্রিপুরা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান

আজাদ বুলবুল

ত্রিপুরা সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে সাহিত্য কি এ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্যের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মিলন। সাহিত্য, কাব্য, উপন্যাস এমন একটি রসাতৃক বা রম্য রচনা যাতে এক হৃদয়ের সাথে অপর হৃদয়ের মিলন ঘটে। সাহিত্যের মূল লক্ষ্য জীবনের রূপায়ন। কালাইল বলেছেন, “জাতির মনের কথার লিখিত রূপই হচ্ছে সাহিত্য”। টমাস ফার্মেটের মতে, ‘সাহিত্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের সুখ-দঃখ-পূর্ণ জীবনের দলিল বিশেষ’। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আপনাকে চিরজীবী করার জন্য। যুগ ও কালের শত রূপান্তরের কথা অতিক্রম করে তার ভাবনা যাতে ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকে এটাই তার প্রধানতঃ অন্তরের আশা’। সাহিত্যে সে আশা আকাংখার রূপায়ন ঘটায় এবং সাহিত্য দ্রষ্টার কপালে অমরত্বের জয়চিহ্ন অংকিত করে দেয়।

সাহিত্যের আশ্রয় ভাষা। ভাষা মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। ভাষা এতোই স্বাভাবিক যে, চলাফেরা বা শ্বাস নিশ্বাসের মতো স্বয়ংক্রিয় বলে মনে হয়। কিন্তু ভাষা মানুষের জন্মলব্ধ সংস্কার বা শরীর চেষ্টাগত অভ্যাসমাত্র নয়। সাহিত্যের মতোই তা স্বতচ্ছূর্ত। শিশু মনের বৃদ্ধি তার ভাষা ব্যবহারের সংগে সংগে এগিয়ে যায় বলে মাতৃভাষা লাভে শিশু কখনো সজ্ঞান প্রচেষ্টা অনুভব করে না। আর এ ভাষাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হয় সাহিত্য যা সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বর্তমানকে ধারণ করে। ত্রিপুরা সাহিত্য প্রসঙ্গের বিষয়টি সাহিত্য আলোচনার একটি অনালোকিত দিক। রচনার স্বল্পতা, লোক সাহিত্য-মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা, এগ্নানকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কারনে ত্রিপুরা সাহিত্য অনাদর আর অবহেলায় মলিন।

ত্রিপুরা সাহিত্যের আলোচনার শুরুতেই এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা যাক।

ত্রিপুরাগন পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রত্যেক থানায় তারা বসবাস করেন। ত্রিপুরাগনের একটি উপদল বান্দরবানে ‘উসুই’ নামে এবং আরেকটি উপদল রাঙ্গামাটিতে ‘পুরান ত্রিপুরা’ নামে পরিচিত। স্মরনাতীত কাল থেকে ত্রিপুরাগন জুম চাষ কেন্দ্রিক আর্থ সামাজিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত ত্রিপুরা জনগন এই কাঠামোতে স্থির আছে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সন্তানের জন্ম, শিশু শিক্ষা, যৌবন প্রাপ্তি, জ্ঞাতি সম্পর্ক, শালিস বিচার, আইন-আদালত, বাসস্থান, আহার্য, পানীয়, পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার যাদুমন্ত্র, তুকতাক, বশীকরন, চিকিৎসা, বিবাহ, নৃত্যগীত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত মৌখিক সাহিত্যে ত্রিপুরা লোক জীবনের চিত্র ধরা পড়ে।

ত্রিপুরাগনের সাংস্কৃতিক ভাবনাই তাদের সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহামূল্যবান হাজারো লোক কথা, কাহিনীতে তাদের জীবনচিত্র স্পষ্ট। সমাজে এবং মুখে মুখে প্রচলিত অজস্র কথা, উপকথা, গল্প, কাহিনী, ছড়া, কবিতা গান,

প্রবাদ, ধাঁধা, কিংবদন্তী ইত্যাদি ত্রিপুরা উপজাতীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ত্রিপুরাগন এসব প্রাচীন সাহিত্যকে তাদের ঐতিহ্য হিসাবে গ্রহণ করে। রাউনী-বাউনি, কোচুক-হা-সিকাম তান্নায়' সহ প্রচলিত অন্যান্য মৌখিক সাহিত্যগুলো ত্রিপুরা লোক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ত্রিপুরা মৌখিক সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত লোক কাহিনীগুলোর টাইফ ও মোটিফ সমতল বা সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ত্রিপুরা লোক কাহিনীর শেকড় ভারতীয় লোক কাহিনীর বাহিরের কিছু নয়, কিন্তু কাহিনীর উপস্থাপনা ও ঘটনার বিন্যাসে পার্থক্য ধরা পড়ে। ত্রিপুরা লোক কাহিনী ভারতীয় লোক কাহিনীর সাথে 'ম্যাকানিক্যাল মিকচারে' পরিণত হয়েছে। যেমন শেয়াল বিষয়ক কাহিনীর ভারতীয় ধারা হচ্ছে, শেয়াল পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ত্রিপুরা লোক কাহিনীতে শেয়াল একটি বোকা ও অসহায় চরিত্র।

ত্রিপুরা রূপকাহিনীতে রাক্ষস, খোঙ্কস, জ্বীন-ভূত ও দৈত্যের চাইতে বন্য প্রাণীর উপস্থিতি অধিক। ত্রিপুরাগন প্রকৃতিচারী বলেই বোধ হয় তাদের কাহিনীতে বন্য প্রাণীর সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

'খুমপাই কারাকক' গল্পের সাধেংগিরি অচাই আর দু'মেয়ে কসমতি ও গোমতির কাহিনীতে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক দুর্গমতা, ভিন্ন পদ্ধতির চাষাবাদ, প্রায় যাযাবর জীবনচারণ তাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে ভিন্নমাত্রিক পরিবেশ। ত্রিপুরাদের নৃত্যগীত, ধাঁধা, কৌতুক ও প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে তাদের সমাজের অনু-বস্তু-আশ্রয়ের সংস্থান তথা জুম চাষ, শিকার, বন থেকে খাদ্যদ্রব্য ফলমূল সংগ্রহের প্রানান্তকর পরিশ্রম, এক কথায় জীবনের পূর্ণরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিপুরা আদিবাসীদের লোক জীবনের পরিচয় আবিষ্কার তাদের লোক সাহিত্য চর্চার মধ্যেই সম্ভব। ত্রিপুরা লোক গাঁথা 'পুন্দ তান্নায়' লালমতির সাথে সুমন্ত হেমন্তের ত্রিভূজ প্রণয় বীর রসের মাধ্যমে উপস্থিত। এখানে নায়কের ছাগলে পরিনত হওয়া, দেবতার আশীর্বাদে মহাশক্তি অর্জন করা, আবার শক্তিহীন হয়ে পড়া এবং সুমন্তের হাতে হেমন্তের পরিণতি ঘটান মাঝে মঙ্গলকাব্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ত্রিপুরা সমাজের বৈদ্য বা অচাইগন মুখে মুখে যে সাহিত্য রচনা করে তা মস্ত বিশেষ এবং গোপনীয়। বৈদ্যগনের মস্ত উচ্চারণের ভাষা ও ভাব যা পুজা ও লোক চিকিৎসার সময় পাঠ করা হয় তাতে অরন্যচারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কথামালাই প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরাগন ককবরোক ভাষী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় যিনি ত্রিপুরার ককবোরক ভাষার উপর গবেষণা করেছেন; তিনি বলেন 'বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী কুকীচীন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিব্বতী বর্মারূপে 'ত্রিপুরাভাষা গোষ্ঠী' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষার সাথে কাছাড়ী, ডিমাসা রাভা, মেচ, ছুটিয়া, পারো, বরো প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠীর মিল রয়েছে। যে জন্য ত্রিপুরাগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। লিখিত সাহিত্যের সংরক্ষিত রূপের কথা বাদ দিলে ত্রিপুরা সাহিত্য সর্বাংশে মৌখিক। ময়মনসিংহের গারো উপজাতির কোন একটি লোক কাহিনী কিংবদন্তীর সাথে

সিলেটের মনিপুরি ও খাগড়াছড়ির ত্রিপুরাদের লোক কাহিনী কিংবদন্তীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ মানিকছড়ি বা রামগড়ের মারমাদের কাছে একই কাহিনীটি অজ্ঞাত। লোক সাহিত্যের এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই রয়েছে ত্রিপুরা সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যতার কথা। ত্রিপুরা সাহিত্য এক স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা। ককবরোকভাষী ত্রিপুরা সাহিত্যিগন তাদের রচনায়, গল্পে, কবিতায়, ছড়ায় যে ভাবানুভূতির প্রকাশ ঘটায় তাতে বর্ণনাগত, ভাবগত ও চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। 'ভ্রমর কালো চোখ, ডাগর দু'টি আঁখির মুগ্ধকর বর্ণনা ত্রিপুরা সাহিত্যে অনুপস্থিতি। নৃতাত্ত্বিক কারণে চোখের উপমা হরিনের চোখের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ত্রিপুরা সাহিত্য চর্চায় সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরার নাম অগ্রগণ্য। তাঁর 'ককবরোক ভাষার অভিধান ও ব্যাকরন' (১৯৮৮), পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি (১৯৯৪) ত্রিপুরা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অনন্য সংযোজন। ত্রিপুরা সংগীতকে আধুনিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তার যে অবদান সর্বজন বিদিত। বরেন ত্রিপুরা ১৯৬৬ সালে অজানা পাহাড়ী সুর নামে একটি গানের পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে লেখক হিসাবে আবির্ভূত হন। 'পুন্দা তান্নায় জিজোক পুন্দা' তাঁর সম্পাদিত একটি জনপ্রিয় ত্রিপুরা গীতিকাব্য। ত্রিপুরা চারন কবি সাধু খুশিক্ষ ত্রিপুরার দু'টি চটি বই 'ত্রিপুরা খাকচাংমা খুমবার বই' ও প্রান কা চাংমা সুধী জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাছাড়া ডঃ প্রশান্ত ত্রিপুরা, সুরজিত নারায়ন ত্রিপুরা, প্রভাংশ ত্রিপুরা, শুধাংশ বিমল ত্রিপুরা, মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মলয় কিশোর ত্রিপুরা, রন বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, বি.এল. ত্রিপুরা বরেন- প্রমুখ সাহিত্যকর্মীদের নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা সাহিত্য ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। তাছাড়া শিক্ষক গবেষক গাজী গোলাম মাওলার ত্রিপুরা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি গবেষণা ধর্মী নিবন্ধ আমেরিকার স্টেট ইউনিভার্সিটি জার্নালের ১৯৯৪ সালের বেঙ্গল স্টাডিস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রিপুরা সাহিত্য চর্চার আনুষ্ঠানিক ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের মনে হলেও অষ্টাদশ শতকে শুক্রেখর বানেখর রচিত 'রাজমালা' হচ্ছে ত্রিপুরা সাহিত্যের আদি নিদর্শন যদিও 'রাজমালার' ত্রিপুরা প্রজাদের কথা বাদ দিয়ে রাজাদের আলোচনা মুখ্য হয়ে উঠেছে কিন্তু লিখিত সাহিত্য বাদ দিয়ে মৌখিক সাহিত্যের বিচার করলে দেখা যায় ত্রিপুরা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ত্রিপুরা লোক সাহিত্য। এতে বনকন্যা জুমিয়া আদিবাসী ত্রিপুরা রমনীর দুঃখময় তেজদীপ্ততার ইংগিত পাওয়া যায়। এ সাহিত্যে রয়েছে সাপ, শিয়াল, শুকর, পেঁচা, বানর, বাঘ ইত্যাদি প্রাণীর নায়কোচিত ভূমিকা বিষয়ক গল্প।

ত্রিপুরা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করতে হলে এই সাহিত্যের মৌখিক ধারা তথা লোক সাহিত্য পর্যায়ের কাহিনী সংগ্রহ সংকলন, গ্রন্থনা, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'ত্রিপুরা সাহিত্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা' একটি মূল্যবান স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ত্রিপুরা জাতির লোক নৃত্যের আদিরূপ

অপুল ত্রিপুরা

মানব জাতির আসল পরিচয় হলো তার সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়েই একটি জাতি তার স্বকীয় সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকে। পৃথিবীতে যার সংস্কৃতি যত শক্ত তাকে ধ্বংস করা তত কঠিন।

শিল্প সংস্কৃতিতে অদ্বিতীয় হিসাবে ত্রিপুরা জাতির নিজস্ব সু-পরিচিতি রয়েছে। এ নিজস্বতা সম্পূর্ণরূপে তার জাতীয় স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। মানব সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো “মানব সম্পদ”। মানব সম্পদকে সমাজের শিখড়চূড়া বা অতিকাঠামো বলা যায়। নৃত্য-গীত, শিল্প-সাহিত্য, ভাষা-চিত্রকলা প্রভৃতি মানব সম্পদের অংশ বিশেষ। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম শিল্প হলো নৃত্যকলা বা নৃত্য শিল্প।

মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ আদিম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যখন কথা বলতে জানতো না তখন একে অপরের মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাত, পা, চোখ নেড়ে বা ইশারার মাধ্যমে যে অঙ্গ-সঞ্চালন করা হতো তখন থেকেই নৃত্যকলার সূচনাকাল বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া নৃত্যকলা শুধু আকার ইংগিত, কৌশলপূর্ণ গতিবিধি বা অঙ্গ-সঞ্চালন প্রক্রিয়া নহে, ইহা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার একটি গতিশীল গুণ।

ত্রিপুরা জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নৃত্য-গতি। নৃত্য-গীত ত্রিপুরা জাতীয় জীবনের প্রাণ বলা যায়। ত্রিপুরা পাড়া-গাঁয়ে আজো দেখা যায় সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সারা পাড়াময় নৃত্য-গীতের ঝঙ্কারে ভরে উঠতে।

ত্রিপুরা জাতির নৃত্যধারাকে অধিকতর উন্নতমানের লোকনৃত্য এবং অর্ধ-ক্লাসিক নৃত্যের সমগোত্রীয় পর্যায়ে ফেলা যায়। বর্তমানে মানব সমাজের প্রচলিত নৃত্যধারাকে বিভাজিত করে আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য এবং ক্লাসিক নৃত্য আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (বিশেষ করে উপজাতি বা আদিবাসী) প্রচলিত নৃত্যধারাকে আদিবাসী নৃত্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বর্ণিত হয়েছে বৈচিত্র্যহীন ও বহিঃ সংস্কৃতি বলে। আদিবাসী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার অধিকাংশ নৃত্যধারা আদিবাসী নৃত্যের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন : বোতল নৃত্য, গড়িয়া নৃত্য বা খেরেবায় নৃত্য, খুম খলনাই বা ফুলতোলা নৃত্য, হোগ্ খাইনাই বা জুম নৃত্য ইত্যাদি নৃত্যগুলো অধিক উন্নতমানের।

বোতল নৃত্য পরিবেশনা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা এর অনবদ্য ছন্দময় নৃত্যশৈলী, রূপশৈলী ও গরিমায় মুগ্ধ হবেন। আর যাদের নৃত্যরসের একটু আধটু প্রতীতি জন্মেছে, তাঁরা এই নৃত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্লাসিক অথবা বিদেশী উন্নতমানের ট্যুইস্ট নাচের রূপ প্রত্যক্ষ করবেন। অনুরূপভাবে গড়িয়া নৃত্যও রয়েছে ত্রিপুরা জাতির সামগ্রিক জীবনধারা।

গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরা জাতির জনপ্রিয় লৌকিক নৃত্য। এ নৃত্য উৎসবটি ত্রিপুরা জাতির লৌকিক দেবতা গড়িয়া দেবতাকে কেন্দ্র করেই এ নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। হোগ্ খাইনাই বা জুম নৃত্য ও শুম খলনাই বা ফুলতোলা নৃত্যও আধুনিক নৃত্যধারা পর্যায়ের উন্নত লৌকিক নৃত্য।

এছাড়া ত্রিপুরা জাতির বিভিন্ন দফা বা গোত্র ভিত্তিক কিছু নৃত্য চর্চার কথাও জানা যায়। যেমন : উসুইদের (ত্রিপুরা জাতির একটি দফা বা গোত্রের লোক) “মাইলুকমা নৃত্য” অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নৃত্য। ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবকে ঘিরে তারা এই নৃত্য-গীত পরিবেশন করে থাকে। যে বছর অনুদাত্তী লক্ষীর কৃপায় জুমে ভাল ফসল হয়, স বছর সারা গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে মহা আনন্দের সাথে “মাইলুকমা নৃত্য-গীত” অনুষ্ঠান করে থাকে। এ নৃত্যে পুরোহিত বা সর্দার চাঁদোয়া কাপড়ের লম্বা আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে, হাতে বাঁশ দ্বারা নির্মিত লক্ষীর নিদর্শন স্বরূপ “ওয়াথব” নিয়ে মাইলুকমা নৃত্যগীত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে। পুরোহিতের সাথে আরেকজন নৃত্যশিল্পীও অনুরূপ পোষাক পরিধান করে এক হাতে ধানের গোছায় নির্মিত একটি প্রতীক নিয়ে নৃত্যে অংশ নেয়। নবান্ন উৎসবকে ঘিরে ত্রিপুরা জাতির অন্যান্য অনেক দফা বা গোত্রের লোকেরাও অনুরূপ নৃত্যগীতের আয়োজন করে থাকে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এরূপ নৃত্য উৎসবের নাম “মাইমিতা নৃত্য”। আক্ষরিক অর্থে “মাইমিতা” বলতে নতুন ধান বোঝায়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসের শেষে জুম ধানের ফসল তোলা শেষ হয়ে গেলে একটি শুভ দিনরূপ দেখে মাইমিতা নৃত্য উৎসবটি পালন করা হয়।

ত্রিপুরা জাতির নৃত্য উৎসবগুলো নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য পরিবেশিত হয়ে থাকে না। এ সমস্ত নৃত্য উৎসবকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সামাজিক ও অপরটি ধর্মীয়।

সামাজিক পর্যায়ের নৃত্যগুলোর মধ্যে, যেমন: বোতল নৃত্য, জুম নৃত্য, ফুলতোলা নৃত্য, ততে-কেলেং নৃত্য, লেবাং বুনাই নৃত্য, আথুক রম্মানি নৃত্য, মশক বুমানি নৃত্য, গড়িয়া নৃত্য ইত্যাদি প্রধান।

আবার ধর্মীয় পর্যায়ের নৃত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে, যেমন: কেরপূজা নৃত্য, পরাকাইনাই নৃত্য, মাইখুলুম নৃত্য ইত্যাদি।

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে প্রধান প্রধান নৃত্যগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো :

১. বোতল নৃত্য :

বোতল নৃত্য ত্রিপুরা জাতির শ্রেষ্ঠতম নৃত্যধারা। ত্রিপুরা রাজ্যে এই নৃত্য “হজাগিরি” নৃত্য হিসাবে পরিচিত। ইহা একটি সামাজিক নৃত্য উৎসব। বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করে বরপক্ষ ও কনে পক্ষের লোকেরা প্রতিযোগিতামূলক এই নৃত্য উৎসবটি পরিবেশন করে থাকে। উভয় পক্ষের শিল্পীগণ মাথার উপর খালি বড় বোতল বসিয়ে, দু’হাতে কাঁসের বাসন নিয়ে মৃদু পদ চালনায় কোমর থেকে নিম্ন অংশকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। শর্ত থাকে যে, যেই পক্ষের মাথা থেকে বোতলটি পড়ে যাবে তাকে মদ, শুকর অথবা মুরগী জরিমানা দিতে হবে।

এ নৃত্যে যা তাক লাগাবার মতো, তা হচ্ছে উদর অংশ ছাড়া কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ওপরের অংশ এক চুলও নড়বে না। কোমর থেকে পা পর্যন্ত নিম্নাংশের সঙ্গে মিল রেখে শুধু উদর অংশটাকে সঞ্চালন করার দক্ষতা দর্শকদের অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে। নৃত্যের আসরে সারিবদ্ধভাবে মাটির কলসী বসানো থাকে। প্রদীপ জ্বালিয়ে গোড়শেণ মুখে বসিয়ে সারিবদ্ধ কলসীর উপর উঠে যখন চক্রাকারে নৃত্য করতে থাকে তখন এক চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। দৃশ্যটি অত্যন্ত নাটকীয় সন্দেহ নেই। অনেকে এ নৃত্যকে ভারসাম্য নৃত্য বলে অভিহিত করেন।

২. গড়িয়া নৃত্য :

জীবন জীবিকাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠান পূজা পার্বণ ধর্মীয় আচরণ সমাজ মানসে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। সেই আদিকাল থেকেই। গড়িয়া নৃত্যও এমনি একটি জীবন ও জীবিকা কেন্দ্রিক নৃত্য। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরা জাতির জনপ্রিয় লৌকিক নৃত্য। ত্রিপুরা জাতির সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বৈসুর দিনে এই নৃত্য উৎসবটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। গড়িয়া দেবতা ত্রিপুরা জাতির নিজস্ব লৌকিক দেবতা। এ দেবতাকে মঙ্গলময় দেবতা বা সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই যেহেতু নৃত্যের উদ্ভব। সেই হিসাবে নৃত্যে দেবভক্তির ভাবনা রসের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত চিন্তা বিনোদনের আনন্দ রসের মিশ্রণ ঘটেছে। বলা বাহুল্য, গড়িয়া নৃত্যের অনুকৃত মুদ্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক ঘটনা ও পশু-পাখির নানা অঙ্গভঙ্গিকে অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সৃষ্টি। শোনা যায়, প্রাচীনকালে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সংখ্যা ২২টি ছিল। এক-একটি মুদ্রা বা ঢংয়ের জন্য এক-একটি বোল। ঢোল (ত্রিপুরী ভাষায় “খাম”) বাজিয়ে বা বোল বাজিয়ে নৃত্যের ঢং বলে দেওয়া হয়। এ বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচের ভঙ্গিও যায় পাল্টে। প্রত্যেক ঢংয়ের অর্থ রয়েছে। কোনটা স্নানের, কোনটা কাপড় কাচার, আয়না দেখে কেশ-বিন্যাস, কোনটা বাচ্চাটাকে খাওয়ানো হচ্ছে ইত্যাদি। এ নৃত্যে একাধিক লোক অংশ নিয়ে থাকে। বর্তমানে ২২টি ঢংয়ের গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে মান পাঁচ-ছয়টির মত প্রচলিত আছে। গড়িয়া নৃত্যের অনুষ্ণ হিসাবে আরো বেশ কয়েকটি নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে, যেমনঃ লেবাং বুমানি ও মশক নৃত্য, ততে-কেলেং নৃত্য, ইত্যাদি।

৩. কেরপূজা নৃত্য :

কেরপূজা নৃত্য ত্রিপুরা জাতির অন্যতম ধর্মীয় নৃত্য। ত্রিপুরাদের কুল দেবতা “চৌদ্দ দেবতা বা খার্চি পূজার” সমাপ্তির চৌদ্দদিন পর শনি কিংবা মঙ্গলবার কেরপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেরপূজা চলাকালীন সময়ে ওঝা বা পুরোহিত, বলিদানকারী সহকারী ব্যক্তি, গ্রাম্য প্রধানকে পূজার বেদীর সম্মুখে নৃত্য পরিবেশন করতে হয় বলে এ নৃত্যকে কেরপূজা নৃত্য বলা হয়। কেরপূজার মূল উদ্দেশ্য জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করা। এ পূজা চলাকালীন সময়ে গ্রামের ভিতরে কোন লোক প্রবেশ করতে পারেনা বা গ্রামের কোন ব্যক্তি বাইরে রাত কাটাতে পারেনা। হাতে খর্গ বা দা নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় ওঝা বা পুরোহিত এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরারা কেরপূজাকে অতি গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে সরকারের সকল অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকে।

৪. লেবাং বুনাই নৃত্য :

ত্রিপুরা জাতির সার্বজনীন লোকনৃত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসাবে লেবাং বুনাই নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই নৃত্যের মূল উৎস জুমখেত। জুম ক্ষেতে ধানের শিশ নির্গত হওয়ার সাথে সাথে অপরিপক্ষ বীজ ধানের নরম অংশটি লেবাং নামে কীটের (বাংলায় পঙ্গপাল জাতীয়) অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। অজস্র লেবাং পোকের আক্রমণে জুম ফসল নষ্ট হয়। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লেবাং বিতাড়ণের যে কৌশল বা পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে এবং পোকা তাড়াবার সময় যেভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে হয়, কিভাবে ছন্দাকারের দৌড়াতে হয়, সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করতে হয়, এ সবার ছন্দোবদ্ধ মুদ্রা সমষ্টির বহিঃরঙ্গ রূপই লেবাং বুমানি নৃত্য। লেবাং নৃত্য পরিবেশিত হয় এক টুকরো আস্ত বাঁশের তৈরী শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের তালে তালে। লেবাং নৃত্যকারীরা দু'হাতে দুটো টুকরো বাঁশ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে ঐক্যবাদন সৃষ্টি করতে থাকে। তালবদ্ধ জোর শব্দের আকর্ষণে লেবাং ঝাঁকে ঝাঁকে জুমখেতে নামতে থাকে। এবং তখন নৃত্যকারীদের জুমখেতের উঁচু নিচু অংশে লেবাং ধরার বা মারার ভঙ্গি করতে হয়, সেই অনুকৃত মুদ্রাই লেবাং বুমানি নৃত্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে ত্রিপুরা জাতির প্রচলিত সবকটি নৃত্যধারার পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দু'একটি নৃত্য সম্পর্কে শুধু আলোচনা করা হয়েছে, তাও সংক্ষিপ্ত আকারে। তাছাড়া অনেক নৃত্য রয়েছে যেগুলো এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে।

ত্রিপুরা জাতির প্রচলিত লোক নৃত্যের ধারায় যেমনঃ- বোতল নৃত্য, গড়িয়া নৃত্য ইত্যাদি ইতিমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। অন্যান্য নৃত্যগুলোকেও জনপ্রিয় ও উন্নতমানের করার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং এর পাশাপাশি এগুলোর ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

- ১। ত্রিপুরা আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি - সুরেন দেববর্মণ।
- ২। বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত - পৃষ্ঠা ৪৯।
- ৩। উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮২ ইং।
- ৪। উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি - জাফর আহমদ হানাতী।

গেঙউলী : অন্ধকার যুগের পথিক

সুখেশ্বর চাকমা (পশ্টু)

চাঙমা' সমাজের জীবন ধারা আজ আর আগের মতো নেই। পাল্টে গেছে জীবিকা। পাল্টে গেছে বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধ। ইতিহাসের অনেক পথ অতিক্রম করেছে চাকমা জাতি। জীবিকার পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক কারনে লোক সাহিত্যের বিপুল ভান্ডার আজ প্রায় বিলুপ্ত। যা কিছু বেঁচে আছে তার অধিকাংশ গেঙউলীদের মুখে মুখে। গেঙউলী' সম্প্রদায় চাঙমা লোক সাহিত্যের অন্যতম ধারক ও বাহক। গ্রামে গ্রামে এখন আর গেঙউলী দেখা মেলে না। গেঙউলী গানের আসরও জমে ওঠে না। গ্রামের নিস্তর্র রাতের নিস্তর্রতা কাটিয়ে গেঙউলী গানের আসরের 'রেঙ' শোনা যায় না। বর্তমানে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে খুঁজে দেখলে বড়জোড় ৮-১০ জন গেঙউলী পাওয়া যাবে। তারাও হয়তো আগামী ১৫/২০ বছরের মধ্যে সবাই মারা যাবেন। তাদের উত্তরসূরীও থাকবে না - হারিয়ে যাবে গেঙউলী, চাঙমা লোক সাহিত্যের হৃদ স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে যাবে।

গেঙউলীদের চাঙমা সমাজের চারণকবি বলা যেতে পারে। এ চারণকবি গেঙউলীরা মুখে মুখে বিভিন্ন পালাগান গেয়ে থাকেন। এসব পালাগানে চাকমা জাতির জাতীয় জীবনের অনেক ঘটনাবলীও বর্ণিত হয়ে থাকে। 'চাদিগাঙছারা' পালায় জানা যায় - অতীতে চাঙমারা চম্পকনগর নামে কোন এক জায়গায় বাস করতো এবং চম্পকনগরই ছিল চাকমা রাজ্যের রাজধানী। চম্পকনগরের যুবরাজ বিজয়গিরি সাত চোমুং (প্রায় ছাব্বিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে দক্ষিন দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করেন। আরাকান জয় করে ফিরার পথে চট্টগ্রাম পৌঁছলে পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছোট ভাই সমরগিরি সিংহাসনে আরোহন করেন। এ সংবাদ শুনে তিনি খুব মর্মাহত হয়ে বিজিত রাজ্যে রাজত্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কালের আবর্তে চম্পকনগরের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় - ঐতিহাসিক কারনে চাঙমারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। লিখিত রূপ তৈরী/সংরক্ষণ/পরিবহন অসুবিধার কারনে ইতিহাসে, লোক সাহিত্য ইত্যাদি হারিয়ে যাচ্ছিল। নতুন আবাসভূমিতে গিয়ে গেঙউলীরা স্মৃতি থেকে সুর করে বিভিন্ন পালা/কাহিনী/ ঘটনাবলী নব প্রজন্মের কাছে বর্ণনা করেন। ধীরে ধীরে এ বর্ণনাকারীরা 'গেঙউলী' নামে পরিচিত হতে থাকেন। এ ভাবেই হয়তো গেঙউলী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। নামকরণের ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন গ্যান হলি (জ্ঞান খুলে) বলা থেকে 'গেংখুলী' বা 'গেঙহুলি' বা 'গেঙউলী' শব্দের উৎপত্তি। তাঁদের মতে, গেঙউলী সম্প্রদায়ের লিখিত কোন কিছু থাকে না। নিজের স্মৃতি থেকে পালাগুলো পরিবেশন করে থাকেন। মূল বক্তব্য, সুর, ছন্দ

১. নিজেরা উচ্চারণ করে থাকে 'চাঙমা'। চাকমা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও 'চাঙমা' পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।
২. গেংখুলী, গেংহুলী প্রভৃতি বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হলেও চাঙমা উচ্চারণের অধিক কাছাকাছি বানা 'গেঙউলী'।
৩. উল্লাস ধ্বনি। বাংলায় অনেকটা ধুয়া - এর তো। সাধারণতঃ যুবকরা রেঙ দিয়ে থাকে। এ উল্লাস ধ্বনি গেঙউলী গানের আসরের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

চাকমা ছোটগল্প : একটি পর্যালোচনা

শাশিলা চাকমা

আধুনিক চাকমা সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা ছোটগল্প। সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে চাকমা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। এখনো পর্যন্ত কোন লেখকের গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি এবং কোন সংকলিত ছোট গল্পের গ্রন্থও প্রকাশ পায়নি। চাকমা সাহিত্যের যেটুকু প্রাণ এখনো আছে যে লিটল ম্যাগাজিনে, সেই লিটল ম্যাগাজিনেই চাকমা ছোটগল্পের চর্চা হয়ে আসছে। চাকমা ছোটগল্প নিয়ে খুব বেশী কাজ এখনো হয়নি। তাই সংখ্যার দিক থেকে ছোটগল্পের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যেসব লেখক ছোটগল্প লিখেছেন; তাদের সেই ছোটগল্পগুলো এখনকার বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমি লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরায় বসবাসরত চাকমা লেখকরাও ছোটগল্পের চর্চা করে আসছেন। মূলতঃ সেখানকার ছোটগল্পকাররাও লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় ছোটগল্পের চর্চা করছেন। সে সব লিটল ম্যাগাজিনগুলো আমার সংগ্রহে না থাকার কারনে সেখানকার ছোট গল্প সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় সেখানকার ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা এ লেখায় অন্তর্ভুক্ত করিনি সংগত কারনে।

এ পর্যন্ত যতগুলো ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে সেসব ছোটগল্পগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ছোট গল্পের আঙ্গিকগত দিক বিশ্লেষণ করতে চাইলে অনেক গল্পই ছোট গল্প হিসেবে উত্তোরিত নয়। ছোটগল্পের রূপরীতি, বিষয়বস্তু, ভাব, গঠনশৈলী ও শিল্পরীতি ঐ গল্পগুলোতে অনুপস্থিত। আবার বেশ কিছু গল্পে ঐ দিকগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চোখে পড়ে।

ষাটের দশকের প্রথম থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা প্রবাহ নানাদিকে প্রবাহিত হয়েছে। যে সময় সমাজ থেকে পুঁতি গন্ধময় সামন্তবাদী ধ্যান ধারণা ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস চলছে, ঠিক সেসময় কাণ্ডাই বোধ নির্মাণের ফলে এখনকার জনজীবনে হঠাৎ মানবিক বিপর্যয়, কাণ্ডাই বোধ নির্মাণোত্তর এখনকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে। চাকমা সমাজ আন্দোলিত হয় নতুন চেতনায়। সত্তরে স্বাধীনতাস্তোর নতুন বাংলাদেশে পরিবর্তিত হাওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামেও এসে লাগে। যুদ্ধকালীন সময়ে চাকমা রাজার ভূমিকা এবং তৎপরতা তৎপরবর্তী সাধারণ পাহাড়ীদের প্রতি তৎকালীন সরকারের অবহেলা, বাঙালী হয়ে যাবার আহ্বান পাহাড়ী সমাজে আতংকের সৃষ্টি করে। এ সময় পাহাড়ী সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা নতুন মোড় নেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির জন্মের পর এখনকার পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলন শুরুর পর সরকার এ আন্দোলন দমনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ছাউনী গড়ে তোলা হয়। সশস্ত্র আন্দোলন দমনের নামে সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে অত্যাচার নিপীড়ন। এতে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের প্রতি সরকারের এ অসম অঘোষিত সামরিক তৎপরতার ফলে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পারস্পারিক অবিশ্বাস,

সন্দেহ প্রবনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। এতে সারা পাণ্ডা চট্টগ্রামে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক কারনে এ বিষয়গুলো চাকমা ছোটগল্লে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান নিতে থাকে। মানুষের মনে রাজনৈতিক সংকট, পরিবর্তিত পরিস্থিতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকারের চেতনায় স্বাতন্ত্র্যবোধের যে স্পৃহার জন্ম নেয় তা ছোটগল্লে স্পষ্ট ছাপ পড়ে। তরুন ছোটগল্লেখকাররা এসব বিষয় নিয়ে নতুন উদ্যোগে গল্লে লেখায় উদ্বুদ্ধ হন। এ সময় চাকমা ছোটগল্লে এক নতুন ধারার জন্ম নেয়। ছোটগল্লেখকারদের গল্লে বিষয় বৈচিত্র্য, আঙ্গিক, শিল্প ভাবনা ও শৈলীতে ব্যাপক পরিবর্তন না আসলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও অত্যাচার নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। সে সময়ে পাহাড়ীদের মধ্যে আস্ত একো বিভেদ সৃষ্টি, যুব সমাজে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অন্তর্ভুক্ত তৎপরতা, পাহাড়ী তরুনীদের নৈতিক চরিত্র স্থলনে মদদ যোগানো এবং সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টির জন্য একটি চিহ্নিতমহল তৎপর ছিল। এ অপতৎপরতা সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টির একটি অপপ্রয়াস এবং ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাহাড়ীদের মনে বিশ্বাস প্রোথিত ছিল। এ অন্তর্ভুক্ত তৎপরতা চাকমা সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যা সহজ সরল চাকমা সমাজের রক্ষণশীল মননে অভিঘাতের সৃষ্টি করে। এ বিষয়গুলো চাকমা ছোটগল্লে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। যদিও এ ধরনের ছোটগল্লেখগুলোতে আঙ্গিকগত, শিল্প চেতনা ও শৈলীতে দুর্বলতা স্পষ্ট, তবুও এ সময়ে এ গল্লেখগুলো পাঠকমহলের মন জয় করতে সমর্থ হয়।

চাকমাদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। জুম চাষ ও কৃষি কাজই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। গভীর জঙ্গলে গাছ, বাঁশ কেটেও একটি উদ্যোগযোগ্য সংখ্যক অংশও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু সত্তর দশকের পরে চাকমা সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, আমূল পরিবর্তন আসে পেশাগত জীবনেও। গ্রামে গ্রামে স্কুল বেড়ে ওঠে, থানায় থানায় কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রতি একটি নীরব বিপ্লব শুরু হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হতে থাকে। সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে উন্নয়নের নামে কিন্তু অর্থনীতির কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি। এখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও কোন পরিবর্তন হয়নি। গ্রামের সাধারণ মানুষ হয় শহরমুখী। বেঁচে থাকার জন্য প্রচলিত পেশার পাশাপাশি নতুন নতুন পেশা গ্রহণের প্রবনতা সামনে এসে পড়ে। চাকমা সমাজ একটি প্রথাবদ্ধ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত মানুষ শহরের নতুন জীবনের নানা সমস্যা, প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রতিবেশ, শহরের নানা সংকট, ক্রেদাস্ত জীবন চারণ, তরুন সমাজের অবক্ষয়, নগর যন্ত্রনার বিশ্বাসের টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে ওঠে। একদিকে স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র্যবোধ অন্যদিকে বৈরী পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে হাঁপিয়ে ওঠে চাকমা সমাজ। এখানে গ্রামীণ মানুষ ও শহরের মানুষের মধ্যে কোন ভেদরেখা নয়, নিম্নবিস্ত, নিম্ন মধ্যবিস্ত ও মধ্যবিস্তের সংঘাত নয়, এ যেন অসহায় বিপদসংকুল একঝাঁক মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে। এগুলো চাকমা ছোটগল্লে নতুনমাত্রা যোগ করে। চাকমা ছোটগল্লেখকাররা চাকমা ছোটগল্লে একটি নতুন ধারা নির্মিতিতে প্রয়াসী হন।

এ সময় চাকমা ছোটগল্প বিষয় বৈচিত্রে নতুন রূপ লাভ করে। সে সাথে বক্তব্য, গঠনরীতি, ভাষাশৈলীতেও পরিবর্তন আসতে থাকে। এ সময়ের গল্পগুলোতে আবেগের প্রাবল্য থাকলেও শৈলী ও প্রকাশভঙ্গিতে কোন কোন গল্পকারকে মনোযোগী দেখা যায়।

সুগত চাকমা ননাধন মূলতঃ একজন কবি। তার দু'একটি ছোটগল্প আমার চোখে পড়েছে। বিষয় বৈচিত্রে ও বক্তব্যে এ গল্পগুলো সার্থক গল্প হিসেবে দাবী করতে না পারলেও কাব্যিক ঢঙে লেখা এ গল্পগুলো চাকমা ছোটগল্প রচনাতে অন্য গল্পকারদের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তার গল্পগুলো পঙ্কন বা রূপকথার উপাদান নিয়ে উৎসারিত।

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যারও কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও ননাধন চাকমার অনুসারী। তার গল্পগুলো রূপকথার বিশেষ ঢঙে লেখা। রচনারীতিতে নতুনত্ব না থাকলেও জুমিয়া স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে তাকে মনোযোগী মনে হয়।

চাকমা ছোটগল্পের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও শিল্প চেতনা সমৃদ্ধ ছোট গল্প রচনায় যিনি প্রাথমিক, তিনি সুহৃদ চাকমা। তার গল্পে তিনি সমকালীন ভাবনা ও চাকমা সমাজের নানা সমস্যাগুলো তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি গতানুগতিক প্রথা ভেঙ্গে নিজস্ব একটি ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সমাজে সামন্তবাদী ধ্যান ধারণা, জাতিসত্তাগুলোর প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা, সমাজের ক্লেদাক্ত দিক, নাগরিক সমস্যাবলী, গ্রামীণ জীবনের অন্তর্গত দিক ও প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি তার গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভাষাশৈলী নির্মিতিতেও তাকে যত্নশীল থাকতে দেখা যায়। তিনি গল্পের প্লট, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষাশৈলীগত কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার গল্পে। এ সময়ে চাকমা সাহিত্যে যদি কোন শিল্প চেতনা সমৃদ্ধ সার্থক গল্প রচিত হয়ে থাকে, তাহলে সে সার্থক গল্পের রচয়িতার দাবীদার সুহৃদ চাকমা। তার অ্যান্টিপলজি, কোচপানা নাঙ পত্তাপত্তি, জিংকানি ও নিজিরেদ কজমা সবনত নাত দি মরানা উল্লেখযোগ্য।

মানস মুকুর চাকমাও চাকমা ছোটগল্পের একজন সচেতন গল্পকার। তার গল্পে এখানকার মানুষের জীবন, প্রেম, বঞ্চিত মানুষের কথা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার আদায়ের লড়াইয়ের ক্ষত বিক্ষত চিত্র, অধিকার হারা মানুষের আকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তার ভাষাশৈলীও চমৎকার। তার একটি গল্পে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের একজন সাহসী যোদ্ধার করুণ মৃত্যুর মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন, যে মৃত্যুর সাথে পাহাড়ের অধিকার আদায় করতে গিয়ে যে সব যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মৃত্যু করুণ আবহ ফুটে ওঠে। তার গল্পগুলোর মধ্যে কোচপানা, চোগ, আল্যাঙর বান্যা সাঙু, ধনপাদার সাক্ষী ও এক সাংবাদিক ডাইরীভূন উল্লেখযোগ্য।

চাকমা সাহিত্যে আরো যে ক'জন শক্তিমান ছোটগল্পকার আছেন তাদের মধ্যে অভয় চাকমা অন্যতম। তার গল্পেও মূলত এখানকার মানুষের বৈরী পরিবেশের সাথে সংগ্রামমুখর জীবন, জাতিসত্তার মূল্যবোধ, অস্তিত্বের প্রশ্নে আপোষহীন, বিপথগামী তরুণীর করুণ আর্তি

ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। তার ভাষা উপস্থাপনার চঙ ও সাবলীল। তার উল্লেখ করার মত গল্পগুলোর মধ্যে ফিরি এজ' আমান'ইদু ও একো গল্প লিগিম ভিলি অন্যতম।

এছাড়াও শক্তিমান ও প্রতিভাধর ছোটগল্পকার হিসেবে যারা নিজেদের তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে রাজা দেবানীষ রায়, চিরঞ্জীব চাকমা, শ্যামল চাকমা, মৃন্তিকা চাকমা, কনকচাঁপা চাকমা, হরি কিশোর চাকমা, রাস্কীন চাকমা ও মহাত্মা দেওয়ান-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমি বলবো চাকমা সাহিত্যে ছোটগল্পের শাখাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ছোটগল্পকারদের আরো ব্যাপক পরিশ্রম করতে হবে। গল্পের প্রুট, ক্টিয়বস্ত্র ও শিল্প প্রকরণগত বৈচিত্র আনার জন্য আরো সচেতন হতে হবে। শিল্প রস সমৃদ্ধ ছোট গল্পই সার্থক গল্প। আর এ সার্থক গল্প লিখতে হলে সমকালকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ছোট গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস “চাকমা উপন্যাস চাই” শিরোনামের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন - “চাকমা সমাজ ব্যক্তির উদবোধনের এই ক্রান্তিলগ্নে চাকমা ভাষা ও চাকমা জাতি আজ উপন্যাসের প্রতীক্ষা করছে। অনুপ্রাণিত ও দায়িত্বশীল চাকমা শিল্পী কি মাতৃভূমির এই তৃষ্ণা মেটাবার উদ্যোগ নেবেন?”

চাকমা ছোট গল্পকাররা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের “চাকমা উপন্যাস চাই” লেখাটি পড়েছেন? তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য তাই ছোটগল্পকে নিয়েই আগে ভাবতে হবে। সার্থক শিল্প সমৃদ্ধ ছোট গল্পের হাত ধরেই চাকমা উপন্যাস বেরিয়ে হয়ত আসতেই পারে।

আদামত বোয়চক্র (বৃহচক্র) চলের। ম' ঠেঙ' পাদাত ইক্কো শাল ফুধেয়োং। শাল নয়, আজলে নাঙল ফাল। সে নাঙল ফাল্লো কয়েক মায আগে ম' আতঠ্যেবো নাঙল' কাম গতে সলাত আহরেয়ে, য়ে সিবেই ম' ঠেঙ' পাদাত ফুদি তেহ্ সুপ পা অল'। ঠেঙ' পাদা গোদা রোগানী। ফাল্লোও গোদা বেকবাক সোমে মর বোয়চক্র চানায়ানও মাদি অল'। সোম্মে দ' সোম্মে আ' একুইবারে সাখ্যে মাধান। হাক্কনপর অলে বেক বোয়চক্রত ঝাগ ঝাগগুরি বেরা য়েবাক, মর য়েয়ে কবাল হরাপ। ইক্কু দিনোত অলে হামাকায় ডাক্তারইদু। সকে কুধু ডাক্তর! ম' আতঠ্যেবোয় দ্বি-এক্সা বোদ্যোলি গরিনো, তোই সাঝং সাঝং ঝারত য়োয় দারুতুলি ঘরত য়োয় শিল' উত্তরে তুলি বাদিদি একান ফাদা কানিলোই দিলো বানি। ঘরত বেকুনে যুগলো ধরিলাক বোয়চক্রত য়োয় দোলী তামজা চেবাল্লোই। সিতোই যা' কাবরচুবোর তে' য়ে যিঙিরি পারে লো ধুরিলাক। কবাল হরাপ আমা দ্বিজনর, মুই আ ম' ইক্কো জ্যেত্ঠা য়িবেই এক্সা তুলুকচুলুক। কধাদ' এল' বেকুনোর য়েবার, কালিক মর তিনেং-ফাল্যেঙে ফাল ফুধেই ম' লগে লগে ম' জিধুরও কবাল হরাপ। আ' দ্বিজন ন' যাদন, সিয়ুন অলাক ম' আতঠ্যেবো আ' বরঙাবো। তারাই এক্সা সে বাবত্যে রঙ্গধঙ্গতুন সুরি থান। কিত্তোই মুই আজার-থোগেও সুপ ন' পাং। তারাই ভাল ন'যান, আমার দ্বিজনরদ' ইজু য়েবার কথা এল। য়ে ম' দুজে এ বাবত্যে অবস্থাত্। সাঝগুঙি য়োই ঘরতুন য়িয়ুনে য়েবার বেকুনে গেলাক্কোই। হাক্কনপর মর ঘরানত লাগের চিকচিক্যে, সিভুন বোয়চক্রত যাদনদে মানুচুনোর আ' বোয়চক্রত লুঙ্যোউনোর জোল আ' ফগনার পুঁ-পাঁ গুনি আর পরানে ন' মানিলো, সিতোই ধুরিলুং কানানা। ম' জেত্ঠাবো হাক্কন ম্যে' জোল গুরিলো কালিক গুরি কি অব', তোই আ মর ডগবান স্যো অয় পা অল। মে' চুবে চুবে কয়দ্যে হাক্কন অলরগুরি থাক, দোলি তামজা ফাং অবার এজ' দিরি আগে - মুই তরে নেযেম। ম্যে' নেযেদে, ন দেগচ টেঙানদোই আহ্দি ন' পারংগে যক্কে কোলুং, তে' ম্যে' কয়দে সিতোই কিয়ে চিদে গরচ, তুই উধিবে ম' হানাহ্ উত্তরে, মুই লুমিলেগোই তুইও লুমিবেগোই। ম্যে' কন্না পার আর সকে, যারে কয় হুজিয়ে কানানা। এক্সা রেদ অনা য়েরেদি জিদু কাহ্নাত উধি, ঠিগ কাহ্নাত নয়, আজলে গন্তাবোত ব্যোয় দ্বিহিতোদি ঠ্যেং দ্বিয়েন দি আমি লর দিলোং বোয়চক্রইনদি। দ্বিজনর দ্বিয়েন আহ্ত কাবর। দ্বোজনে আহ্ত কাবরানিলোই মুয়ানি ডাক্যে, এক্সা এক্সা চোকখুন চিন পায়দ্যে বানা। সে বাবত্যে অনার করম অলদে য়েনে আমারে আমা ঘোরবোউনে কিয়েয় ন' চিনোনপা। দ্বোজনে বোয়চক্র লুমিলোংগোই। ম্যে' ইক্কো বাহ্জি ফগনা' কিনিই লোয় দিলো। সকে চিগোনগুরোউনে সিয়ুন পেলে আর কিচ্ছু ন' লাগে আর। পিয়েংও সিবে ফুলেই ডগরা ধুরিলুং। সিঙিরি দ্বিজনে ঘুরো ধোজ্চেই, ঘুরোদে ঘুরোদে কনবাবদে বেগভাগ ঘুরি ফুরেয়েইদে আয় হাক্কনপর শুনিত্যে রাঙামাত্যেতুন ভিলে একঝাগ কলেজ' পো লুমবোনদি। বেকুনো মুয়োয় মুয়োয় বোয়চক্রত ভিলে জু-খারাহ্ খবার দিদাক নয়। জু-খারা খইয়োউনরে ভিলে লোরে লোরে ধুরিবাক। পোল্যে পোল্যে জু-খারা খইয়োউনে য়োয় সাদোক সালেন, বন্ধগুরি দিচাদোক্কি সালেন তারারে এক্সা বুজে দিদোং মালেন, কালিক যক্কে দচ-বারজন কলেজ' পো শোলোগান দি দি 'জুয়া খেলা চলবে না, জুয়া খেলা বন্ধ কর' গুরি গুরি লুমলাক্কি, হাক্কনপর চেইদে জু-খারা খইয়োউন কিয়েয় নেই। আমক আমি, আমা মুজুঙে খারা

খেলদন, সিন্ধুন দেবংসি করম দক য়্যেয় দিগিলোং আ' য়্যে নেই। বোয়চক্রত য়্যেচোউন ঝাণ ঝাগ কলেজ পোউনোইদি বানা একাণ্ডরি তারারে চেবার। ইয়ুন কি বাবতো য়্যিযুনের এদক ত্যেজ। য়্যে জাগাত পুলিচ-দারোগায় জু-খারা বন্ধ গুরি ন' পারন সেজাগাত কয়েক্কো কলেজ' পো য়্যেনেই জু-খারা খইয়্যেউন ধ্যে য়্যেয় পেলাক। মুইও জিদু কানাতগুরি গেলুং। মর একা চে। পেবার বেচ জু আঘে, কারন মুই জিধু কানাহ উগুরে। মাহ্ চাংগে কলেজ পোউন' সিয়োত ইক্কো ম' হাক্কা। মানে মর সহ্দের নয় বাহ্র পিজেঙাপুত ভেইবো য়্যেহ্ সহ্দের হাক্কা। সিবেই বেগ' আক্কো আক্কো। জিধুরে কংগে জিধু তারাহ্ আকোইদিগুরি থিয়্যেয়্যেয়। আজলে ম' হাক্কাবো চোগোত য়্যেনে স্যেনে পড়ানা য়্যেনে ঘরত কোয় পারংগোই হাক্কা ম্যে' দেক্খ্যে। মুই আজলে হবর ন' পাং ম' সে হাক্কাবো কলেজত পড়ে, বানা হবর পাংগে ত্যে রাঙামাত্যেত পড়ের। ম' বুক্কো দচ্ আহ্ত অজল। ম' হাক্কাবোরে সালেন জু-খারা খইয়্যেউনে ডরান। হাক্কনপর বোয়চক্রয়ান দ্বি-এক পাক ষ্যেয় শোলোগান দিদি তারাই একহিত্যেদি গেলাকগোয়।

আ' কয়েক বয়র পরে আদামত ভিলে মিটিং অব'। মিটিঙোত গুরো-বুড়ো, গাবুর মিলে-মরদ, বেক্কুনোরে য়্যেবাত্তেই কোয়োন। মিটিং ডাক্কোনদে সিউনেও রাঙামাত্যেতুন এচ্ছে কলেজ' পো। আদামত বেক্কুনোর মুয়োয় মুয়োয় - কলেজ' পোয় ভিলে মিটিং গুরিবাক। মিটিং অব' বেল্যে মাধান। এতে উতারে, উতে এতারে পুজোর গরদন মিটিঙোত য়্যেবাকনে ন' য়্যেবাক। এ আক্কি ধি সে বাবতোগুরি কন মিটিং ন' অয়। সিত্যেই বেক্কুনোর মুয়ো মুয়োয়। বেল্যে মাধান আদামর একান ঘর দাঙর উধোনত উধোন ভরন মানুচ চিগোন-বুড়ো, গাবুর মিলে বেক। মুইও ম' কয়েক্কো সমাজ্যোলোই গেলুং। আমারদ' বেচ চেবার আওয়োজ - কালিক মিটিঙান নয়, কলেজ পোউন। কালিক য়্যিউনরে চেবাত্যে এদক ধারাজ সিয়ুন এজ্ ন' লুমোনদি। বেক্কুনোর পদহিত্যে চোগ, হক্কে এবাক। হাক্কনপর মিলে দ্বিজন মরদ তিনজন লুমিলাক্কি। বেক্কুনে গন্তানা আলক আলকগুরি তারারে রিনি চানা। মুই চেইনেই আমক য়্যে আমন' দক হেনজর মেনজর। আ' সিউন ভিলে কলেজ' পো! তারাই বুজিবাত্যেই চেয়ার পাদে দ্যে য়্যোয়্যে। হালিক বেক্কুনে আমক - তারাই চেয়ারানিত ন' বুজি আমা বেক্কুনো দক তোলোয়্যে উগুরে ব্যেক ব্যেক বুজিলাক। হালিক বুজিবের আক্কোদি ইক্কোয় কয়দে, বাব-ভেই, মা-বোনলক ইয়্যোত আমাতুন বেচ বয়জে দাঙর আগন, তুমি য়্যে চেয়ারানি পাদি দি আমারে কিত্যেই লাজ দিবের চহ্র। কয়েকজনে কলাক, তুমি কলেজ' পো, আ সিন্ধুন গরবা সিত্যেই তুমি বজিবেত্যেই পাদে দ্যে য়্যোয়্যে। হাক্কনপর তারা পাচজনতুন একা চিগোন-চাগোনগুরি মিলেবোয় পথম উধি বেক্কুনোরে লাঘা ইক্কো জু দিনেই কথা কো ধুরিলো। পোল্যে একা লাহ্রে লাহ্রে য়্যেরেদি একুইবারে মুয়োত খোয় ফুদে পা কথা কো ধরলো। একা উধোনত ইধুক্কন মানুচ হালিক একুইবারে খালদ পানি দ্যে পা। একজন একজনগুরি য়্যেরেদি পাজোজনে কথা কোয় ফুরেলাক। বেক্কুনে য়্যে কথানি কলাক সিয়িনি বেক্কানি ছাগি ললে অয়দ্যে - আমি মুরো স্যেরে বোন্দাএন কিত্যেই, কিঙিরি এবাবতো য়্যোয় য়্যোর আজলে সক্কে সেবাবতো হরাপ অবস্থান্দি কিঙিরি য়্যের আদাম্যেউনরে বুঝে দিবার চেরেষ্টা গোরিলাক। তারার কথা দগে যা বুঝে গেল পর মান্যো আমারে য়্যিদ্ধুর গিলিব গুরি বচ্চ গুরিবের চাদন সিন্ধুন বেচ গরদন আমন মানুচচুনে। মুর কথা অল ঘর উন্দুরে বের কামেরেলে কন বেরেই টান ন' মানে। সিত্যেই তারা কথাদগে আগে ঘর উন্দুরকন স্যোরগুরি তেহ্ বাহ্র উন্দুরুকনাকিত্যে চোগদি থা পুরিবো। আর উন্দোরো হাচ্চোত বের কামেরেবাক, গিরোচ্চোয় য়্যনি উন্দুরকন ধোঙেবার চেরেষ্টা ন' গরে সালেন উন্দোরো গুণ্ডি

বাহরি বাহরি যেহেদি আর ধোঙে পারা যেদ' নয়। সিত্যেই আক্কেধুরি গিরোচ্চায় সজাগ য়ায় ঘর উন্দুরুন ধঙা পুরিবো। আ' ঘোরবোউনোর বানা একজন-দ্বিজন সজাগ অলে ন' অব, ঘর বেকুনোত্তুন সজাগ য়ায় উন্দুর ধঙানাত লামা পুরিবো। ঘর উন্দুরে বের কামারান্দে পোইল্যোদি একা একা, যেহেদি য়োন গুরিবাক বেরান আর টুনিবের জু ন' থায় একুইবারে বোদোলে দেয় পরে। সিত্যেই একা একা খামারা ধরতেই উন্দুরুন ধঙা পুরিবো আ' ঘর বেরান টুনো পুরিবো।

যো দ্বিয়েন কথা শুনেবার ধারাজ গোচ্চোং করম অলদে, সকে দিনোর কলেজ পোউনোর ইন্জেব, কাম মুজিম কাম'র চোগ দেনার আক্কলানি। যে ইন্জেব আ আক্কললোই গোদা হিল চাদিগাঙর বেক বন্দাউনরে চোগোর আহ্মা কাজেহ্দি এককান নুয়ো দিনোর স্ববন দেখে পাচচোন। গোদা বেক মানুচুনোরে ইন্জেব আ আক্কল বাড়েই দি পাচচোন। ঈধ' ঘরত ধিগধিগেদি এককান নুয়ো পদ ইন্দি আধিবার সুরোন গুরি দি পাচচোন। বেল পহর দক পহর গুরি দি ন' পারিলেও আগুনো লুরোর পহর গুরি দোন যেনে আঙচো রেদোর ঘুর আন্দারতও পদ মুজিম আহ্দি পারন।

সেদিন্যে যনি কলেজর পোরবো পোউনে আহ্মা বান্যে চোগ খুলিদি ন' পারিদেক, সালেন এচো আমি হিল চাদিগাঙর বন্দাউনে লেগাপড়ায়ন্দি ইন্দুর পুয়্যোন য়ায় পারিলোঙুন নে না হবর ন' পাং। তারার আদামে আদামে ঘুরোনা যেহেদি আদাম্যেউনোর চোগোত যে বাবতো নুয়ো দিনোর পহর ভাজি উত্তে মর এজো পুয়্যোন চোগোত ভাজে। সে পরেদি আদামত ঘরে ঘরে উহর পল লেগাপরা গরানা, আদামর বের কামেরেয়ো উন্দোর ধঙানা। আমা দোকো বন্দাউনে নুয়ো জীংকানির ইজেরে প্যায় ধুরিলাক নুয়ো পদহিতো লহর দেনা। ইয়েনি এচো পিচো ফিরি চলে এজো পুয়্যোন মন গভীনোত ধুমুলুক খেলায়, বিজেরেয়, বানা বিজেরেয় -।

জুম ঈস্‌থেটিক্‌স কাউন্সিল আয়োজিত প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম
আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা '৯৮ - এর উদ্বোধনী সংগীত

রজেয়ে আ সুর দিয়ে
তরুন চাকমা [মনিবো]

হিল্‌ চাদিগাঙর থল আ মুরোয় মুরোয়
এগারোব জাদ-জুম্ব ইধু আঘিই -
আমা-মায় নেই রিজেরিজি
আমি - আমি আদিবাসী ।

এগ্‌ সুধোত্‌ গাদেয়ে ধক্
আমি আঘিই আমি থেবঙ ।
আমা আঝা, আমা সবন
এগ্‌ ধেলাত আমি ফুদেবঙ ।
আমি ফুদেবঙ -
আমি ফুদেবঙ আহ্‌ঝি আহ্‌ঝি ॥

মুরো থল আ ছড়া নালে
জুম্ব সংস্কৃতি বিলি আঘে ।
এ সংস্কৃতি থুবেই আমি
পিভিমীমায় সিধেবং বেঘে ।
সিধেবঙ বেগে -
সিধেবঙ বেগে আহ্‌ঝি আহ্‌ঝি ।

ঈদত বিচ

দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা

মরন কুলত যুদি যাংগোই তরে ছাড়ি
মরে তুই পুরি ফেলেবে কেজান গরি ।
ত ঈদতানত বাঝি থেম
ত মনানত লুগি থেম
অস্তে অস্তে ঈদত উদিম ঝাঙত গরি ।

ত বেগ সুগত ভাগ বজেম
ত বেগ দুগত চোগ পানি ফেলেম
গোড় অবাক চোকুন তর মরে মনত গরি ।
দেবা কালা আনধার গল্যে
গুরুং গুরুং মেঘ ডাগিলে
বুগ কোনান উদিব তর চিশ্তত গরি ।

আগাজ কিত্যা রিনি চেনেই
মন দুক্কানি ইরি দিনেই
সে মানুচ কুধু যিয়্যো
ভাবি ভাবি কানানি এব
ধারা দিয়ালি চোগ পানিনি
চেরাং চেরাং ঝরি যেব ।

কুধু গেলেগোই মরে ছাড়ি
কোচ পেম মুই নদিম ইরি
কোনদিন আর ফিরেই নদিম আয়না ফিরি ।

কবি দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার এ অপ্রকাশিত কবিতাবুয়্য কবি সুগত চাকমা ননাধনর
তক্ষিদে পা যেয়ে ।

তমারে ঈধত উধে

শ্যামল তালুকদার

কবি সুহৃদ আ কবি দীপংকর
ভালক বজর আ ভালক ভিলোন পর
তমার উদিজে এই কবিতা লেগঙর -
অপরাধ যদি হয়
ক্ষেমা গচ্য তুমি মরে;

সেই কমলে দেগা হুইয়ে, ঈধত নেই, তমা সমারে -
এচ্যা ভালক বজর পরে
ফুজোর গরঙর তমারে,
কেযান আঘ তুমি ? - কেযান আঘ ?

কবিলগ, তমা কবিতায় কথা কয় কেযান দোলেই
নিগুচ-নিগুচ নাগর মাধন মর সমারে;
কবি দীপংকর, তই কি পারচ তুই,
তর মরনর পরে
তর লাঙনির ভিদিরোশুদিত ঘি-এক্কান ঝারাপাদা
সমিবার সারনেনা বৈয়ারে ?
দুলুঙ্কই কেয়্যাএরা কবি কবিতা লেখ্যচ
হাওঝে লেখ্যচ লো-ফুদায় কোচপানা নাং,
কোচপানা কারে কয় শিগেয়চ -
পরানর দুয়ার গরি দ্যচ হাবাংপাং ।

কবি সুহৃদ, ঈধত উধে তরে
কি জানি এ পরান কেযান গরে -
তর সেই বাগীপাল উরি যান মর সোজগাঙ সাজুরী,
নিত্তাগে সাজি থায় তর হাওঝর রাঙামাটা গাভুরী,
নাগর মাধে ম' ধাগত বই তর কবিতা গাভুরী -
আমি বেঘে আঘি, আঘন তর কবি দাঙ্গু মৃত্তিকা-শিশির
শান্তি-ঝিমিত-মানস-চিরজ্যোতি-সুসময়-বীর
আঘে কবি ননাধনে, আঘে ফেলায়েয়া
আঘন আ উদন্দি চাঙমা কবি-সাহিত্যক লগে;

নাঙ আঘে এয সেই ধগে
চেঙে-মেইনী-কাজলং,
আঘে সেই বরগাং - সেই সুবলং
আঘে ফুরামোন, আঘে সোজ, আঘে নীল,
আঘে তর পরানর জুম ঈস্‌থেটিক্স কাউন্সিল;
সেই পেগে সেই ধগে এয গীদ গান
বানা নেই সেই মন, সেই মুগ -
সেই আগসান !

কবিলগ তমা সলঙানি এচ্যা নেই
তুমি আঘ আমা মনে, মনে, আঘে তমা নাঙ
কালে কালে কধা কব তমা কবিতায়
তেব তমা কধা, থেব তমা নিজানী
হাজার বজর হই এ দেজর ছড়াছড়ি গাঙ ।

আমিও কি জনমান ইধু থেবং ?
মরনর পরে আমিও এবং -
হ্লে সেক্কে তমা সমারে
দেগা হ্লেও হই পারে
যুদি কবালত থায় লেগা -
সেক্কে আমারে ডাগি কবানি -
এয এয - কেযান আঘ - কমলে এলা ?
কই কই মুজুঙত এভানি ?
তমা লগে আভাধা যুদি সিধু হয় দেগা ?
দেগা হ্লে ডাগি লইয়া,
সাঙু দোরর সাঙুয়ান পাড়ি থইয়া,
ভারি হ্ওচ তমা ইধু বেড়ে বার;
নানা কধা কই কই,
রেদেদিনে বই রই,
হ্ওচ হয় কবিতা রেজ্যত
মনানি আ নুয়াগরি হারেবার ॥

অমর শান্তি চাঙমার দিবে গীত

সুরও তা'নিজর

(১)

আম্য পুরোন জাগা পানি তলাত, বড়
গাঙত,
আজল জাগা বড় শরত,
আগে আমি যিদু এলং,
রাঙামাত্যা তলে বড়গাঙ পাড়ত॥
ভুঁইয়ে জুমে চাষ গুরিনেই
আমি খেদং ভাত,
মনত সুগে দিন কাদেদং
ন পেদং কনহ্ রাত ।
সুগে এলং মিলি মিঝি
আমা সেই দেজত ।।
এল যধা মন, সুগে দুঘে
বেকুনে ভেই ভেই এলং
গধা পানি এইয় আমি ধেই পেয়েই
ন ধেবার খুব চেলং ।
আমা সুগো দিন ভাজে দি গেলহ্
বড়গাং সাগরত॥

(২)

ও তুঙোধন ও তুঙোবি
তোমা দিদুন রঙে রঙে
রাঙি উত্তোন্দি॥
তুমি অহ্‌বা আমা দেজত
মুজুঙো দিনোর চান
স্বর্গ পুরি বানে লবা
আমা এদেচান ।
লেঘাপড়া শিগি অহ্‌বা
দেজর ভালেদী ।।
ঝাক্কো রঙর রাঙোনী হ্‌বা
মোনোমাধা এ্যাল ঝারদু শিদি পরিবা ।
বেল্‌হ্ পরত মোনো হ্‌বাত
পেক ওই উড়িবা ।
জুম চাগালার ছত্রং ফুল ওই
বেকুন ফুদিবা
মোনো হ্‌বায় হ্‌বায় থেবা
ধুলি ধুলি॥

ধিবাধিপ্যে বুগোর ধুকধুগানি

চাকমা প্রবীন খীসা তাতু

বাজা মরার এ জীংহানী,
অসুনজুক বুগোর ধুকধুগানী ॥

আদুর সাজি বজি থানা -
হেবার চামে শীল পান্তরে ঘজাঘজি
ক্ষয় অই যানা;

রেদে দিনে গাবুর লগর
মদে ভাঙে মুজি থানা;
ফ্রি মার্কেট-অ চালত্ তলে
থিয়েবার চেলে থিয়েই ন পারন্,
ধিবাধিপ্যে বুগোত্ তলে
বিরিচ গরু লাড়েই গরন্ ॥

রাঙা চাঙেই মাধাত্ তুলি
ঠাঙুর নাজন্, গাবুর মিলের কমর ধরি,
মাদির শুগোর চালত্ উধি
দে'র গরি যান ম'বুগ জগা ॥

এই আকালত -
সর্বহারা ফেলাযেয়ে ধুত্ ধরি থায়,
ত্রিদিপ রাজা দেচ্ ইরি যায়,
মুই চুগি থাং আত্যা নানু
লারমা বাবুর এ চবাসাল ॥

তকছা ওরিয়ই থামানি
(পাখীরা উড়ে যায়)
মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

সাল থাংকালাই তকছা তকমুলুই
বথব' থুনি বাগই ।
ওরি ওরিয়ই থাংলাইয়' যত
চুমুইবাই বাকসা খায়ই ।
বদাইয়' বকনি থুনাই বথবরক
কাইসাব' সালাই মায়া ।
ওরক ওরকগই বজরা থানাই
নাইখনই নুখন জাকয়া ।
তব' নাইখন মকল কুসুংসা
বজরা থানাই হিনই ।
নাইতই নাইতই খাই, কামাগই থাংগ'
চুমুই বিসিয়' হাবই ।

বাংলা অনুবাদ :

বেলা শেষে পাখীরা সব
বাসায় ফিরে যায় ।
উড়ে উড়ে চলে যায়
মেঘের ছায়ায় ।
কোথায় যে তাদের বাসা
কেহ নাহি জানে ।
উড়ে উড়ে যাবে কোথায়
যাবে কোন খানে ।
তব' দেখি চোখ মেলে
কোথা যায় বলে ।
দেখিতে দেখিতে যায়
মেঘের আড়ালে ।

ANI EMANG

Mathura Tripura Yarwng

Ani emanglai
Nangwi tongtio
Hachwk sring sringma daio;
Hachwk huiloksa
Chiriwi pungkhai
Ata Hemanta no wansogwi
Abwi Raiboti mokgo.

Ani emanglai
Takjagwi tongtio
Manikya Bograni Hao;
Naran Raikwchak
Goseya tongmani
Sikam Bograno
Goseronani bugo.

Ani emanglai
Katawi tongtio
Kami Roajani nogo;
Rang-khok-Mai-Mwi
Chagwi-nwngwi paia ongo,
Maiung-Korai-Rotha-Rothi
Ura ketewi tongo.

Ani emanglai
Thangwi tongtio
Kok Kwchamrokno wansogwi;
Thangwi tongthwk

Ani emang
Kok Kwchamno lagwi,
Chaya-chukya jotto sibiwi,
Gamrokno hayogwi lagwi

আমার স্বপ্ন
আমার স্বপ্ন রয়েছে আজও
নির্জন ঝুমে
নিঃসঙ্গ উল্লুকের
বিলাপ শুনে শুনে:
যেখানে
শ্রেমিক হেমন্তের
কথা ভেবে ভেবে
প্রিয়তমা রাইবতি' কান্দে ।

আমার স্বপ্ন
বৈঁচে আছে আজও
মানিকা রাজার দেশে;
যেখানে
অবাধ্য কুকিরাজকে
দমন করতে
সেনাপতি 'রাইকাচাক'
অভিযান করে যুদ্ধবিশেষ ।

আমার স্বপ্ন
জোঁগে আছে আজও
ধনী রোয়াজার ঘরে;
যেকানে
যশ, কীর্তি, অর্থ, সম্পদের
পড়তে হয়না অভাবে,
গোলা টিকেনা
ধানের ভারে
গোয়াল টিকেনা
গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়ার ভারে ।

আমার স্বপ্ন
বৈঁচে থাকুক আজ
ইতিহাসের কথা ভেবে;
বৈঁচে থাকুক সে বৈঁচে থাকুক
স্বর্নোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে
সকল মন্দফেলে দিয়ে আজ
ভাল সব কিছু তুলে নিয়ে ।

মনত উথ্যা ধেঙানি

অন্ধ কবি পরমানন্দ বিকাশ দেওয়ান

পাবলখালী পার' টেক্যা থুরুন
মিধে মিধে চবা চবা সুওদ
যেধক কুজি সেধক মিধে, সেধক সুওদ(!)
কি ধার টেক্যা থুর' পাদানি!
কন' বাবদে দুগ্ গোরি ভাঙি খেলে
খানা ওউ উধে মতুন।
তত্তুন দাড়ি উথো, বিগিদি গরন সমস্যাই।

বেল দিভোরর আগেদি খেই দেই
নিঘিলিদং ওরই ওরই
টেক্যা থুব ভাঙা, পোগো বাহ্ পারা আর' ছরা পার'
পাদারি এরেই গাচ্ছ্যতুন
এরেই ঘুন খানা।
পাবলাখালী পারে পারে, টেক্যা ডুব' সেরে সেরে
বিলেই গাদ বিজি গাদ গুদনা।

দাং-দাঙ্যা গোরি রোদ বাঝেদে দিবুচ্চ্যা
বিলেই গাদত বিলেই বিজি গাদত বিজি
বাহ্ ভিদিরে পেগ্ পেগনি
যার যে জাগাত থেদাক বোই।
গুর' লগর গুদ' খেলে, ফুরুত গোরি যেদাক উরি,
চুরুত গোরি দিদেক ধাবা।
উই গেল' গেল'
জগার পাস্তং গুর উনে।
আহ্ধ থেং আ গালচাবা, ঘা-ঘা-ওইনেই এধং ঘরত
মুওনি অহ্ধ' কালা কালা
কিওতুন এধ' চিন্দেবাজ।
অকধা কধাক মাহ্-দাখি
অকধা খেইনে ধাবা ধাবা
কিওই কুওতুন, আ কিওই মেয়নিতুন
এদংগোই বেঙ্কুনে গাধি।

আমি উষেবং

সোমেন চাকমা

আমি উষেবং উষেবং
কাররে আমি ন'দোরেবং ।
আমি উষেবং উষেবং
মুজুঙে যেধোক্যো বাধা পেদ' সাধ্
তুচ্ছ গোরি যেবং ।
আমাতুনও আঘে জাদর সত্ত্বা
সিয়েন আমি অধিকার গোরিবোং ।
এই পিস্তীমির্ বুগত্ আমি
জীবনর মরনর গীত গেবং
ন' দোরেই এ মন লোইনে আমি বেঙ্কুনে সংগোরি
ধাগে পাজারত ন' চেইনে
উজু পধে যেবং ।
আমি উষেবং উষেবং
দুর্ভেদ্য আমি ভেদ গোরিনেই
চান সান্যা পহর ছিদেই নে
আন্দার আমি দুর গোরিবোং
আমারণ প্রতিজ্ঞা গোরিনে
আমি উষেবং উষেবং ।

থ' হিয়ে জীংকানি

মহতী চাক্‌মা

এ হাক্কন্যা কবালত কি পেয়ং মুই
মনত তুলি চেলে কি?
ভাঙা কবালর জীংকানি
এই আঘং এই নেই
জল ছবি ওই থানা।
লনা, চানা, খানা, পিনেনা
হদার জীংকানি শেঝ নেই
কধক আওঝ এল'
মর বাবু অনা দেই---
অলুঙে হুথ্যা টেঙেরা
দাঘ' কধাও আঘে
'মা' আঘে বাপ্ নেই
'কিয়ে লধরা
বাপ্ আঘে 'মা' নেই
পরা বান্দারা
বাপ নেই, মা নেই
হুথ্যা টেঙেরা।

একান চাঙরিতোই অফিস মুজুঙে বেন্নো দচতুন ধোরি একা বাচানা সঙ বাচেই থানার পর পিয়ন্ন এইনেই সংবাদ দিল' "সাপ্পা এচ্যা দেগা গরি পাত্ত নয়, তুমি চের দিন পর এচ।"

তুম-অ সান যিউনে দেগা গরিবাতোই এচন তারা একা বেজার পা-পি অলেও তে ব্যাপারন-রে স্বাভাবিকভাবে মানি ল-ল। সাব মানুচ কাম-করচ বেচ সেনন্তো অয়দ' তারারে সময় দি ন-পারের।

চেরদিন পর অফিসত এই নেই গুনিল' সাপ্পা ভিলে কুধু মিটিঙ গরিবো গোই। অফিসতুন কলাক এয়েন্তে কেপ্তো এবাত্তো।

তা-কেপ্তো অফিস খুলিবার আক্কেই দরখাস্ত আন হাখত গরি তুম-এ বাচেই রলগি। এগারটা বাজিয়েই বারটা বাচি গেল' তু-অ সাপ্পার দেগা নেই। এ-ভিদিরে ভালোকুন মানুচ এগন্তর অয়নদি দেগা গরিবাতোই। প্রায় একো বাজঙ-বাজঙ অল্লি সে-সলাত সাপ্পা এল' এল-দে এনে-ন' এল। মনে অল' বর-বোইয়ের এয়র। বডিগার্ড তু-অ ফুত-ফুত বাজি বাজেই ধাবা দি মানুচুন চিরিনেই অফিস রুম দরজা মেলি ধল্ল। তুম-এ একা চোগত পরে পারা থিয়ে রল'। সাপ্পা লোই চোগে চোগ অনাই তুম-এ নমস্কার জানেল'। সাপ্পা একা গোরি হাজিনেই রুম' ভিদিরে সোমেল'গোই। বডিগার্ড তু-অ তুমর মুজুঙেই দরজাআন বন্ধ গরি দিল'। তুম-এ মনে মনে ভাবিল' এচে হামাকায় দেগা অব'। দরখাস্ত আন ঠিগ আগে কিনা একবার চেই রল'। সাপ্পা লোই কেনে কধা ফগদাঙ গরিব' মনে মনে ঠিগ গরি থল'। ৮১' সাল'তুন ধরি ভারত' ইধু শরণার্থী অনা- সিত্তুন ফিরি এযানা সঙ কধানি কেনে কব মনে মনে সাজে চেল'। ঠিগ এক ঘন্টা পর পিয়ন্ন দরজা খুলি কল' "এচে আর দেগা গত্ত নয় সাপ্পা"। ঢাকাতুন একা ডাঙর সাব এচে। তুমি পচ্চু এয'।

তুম-এ মনে মনে ভাবিল' সাবে যক্কে তাল্লোই হাচ্ছে সালেন তারে ইখত রাগেব'।

হালিক তুম-এ পচ্চু দিন এই ন-পারে। সংবাদ পেল' তারা আদামত ভিলে বাঙালে-চাঙমাই কোল বাজেয়ান। হবরা-হবর লদে লদে দি-দিন পার হোই যেল'। তারা ঘর মানুচুন ভিলে গম আগন। তিন দিন পর অফিসত এই নেই গুনিল' সাপ্পা এই ন-পারে। তারা আদামর ঘদনা লোই তদন্ত-ফদন্ত গরা পরের। তুম-এ তলবিচ গরি যা হবর পেল' একো পাগানা কোঁয়ো মুলোমুলি গত্ত যেই কোঁয়েবুঅ গালা যেয়ে। চাঙমায়্যা বাঙল্লতুন গুনআর চেইনেই ঘদনা-আন ভালোক দুর লুঙে গোই। চাঙমায়্যা গুনআর মাগে- বাঙাল্লো ন-দে। চাঙমা-গঙ যিয়েন বাঙাল্লোয়ে ধাগ-চে একো লাডি। এনে চাঙমা-বাঙালে লরা-লরি। কুধু কোঁয়ো-কুধু কি। চুদো

চুদে। কয়েক মানুষ, গমে-দালে দুগ পেই হাসপাতালত ভর্তি গোরে পেয়ান। একো বাঙাল ভিলে বাজে-না মরে ঠিগ নেই। আ চাঙমা একোৱ ভিলে কি হাখ একান কাবা যেয়ে।

যাই হোক দচ্ দিন পর একাৱ য়ুর' অনাই তুম-এ ঝাদি ছাদি অফিসত এচে। সাপ্পালাই এচে তার অবশাই দেগা গরা পরিব'। কারন হাখত আৱ সময় নেই। ঢাকাত যা পরিব' আৱ' একান চাণ্ডরী তোগেবাত্তাই। অফিসত' এই নেই শুনি' যে বাঙাল-অ মরঙ-মরঙ এল' সিবা ভিলে কি মচে। বেঙ্কুনে কোই-বলাবলি গৰ্তন কির্জনি আৱ' কি(?) গোলমাল উধে! তুম-এ দুগ গোৱি বাচ্ছেই ৱল অফিস মুজুঙে। সয়-সাগর মানুষ এচন দেগা গৱিবাত্তাই। কাৱর চাণ্ডরী দরগাৱ-কাৱর ক্ষতিপূৱন-কাৱর সুপাৱিশ। একো বাজি যেয়ে সাপ্পাৱ এয দেগা নেই।

হাক্কন পর পিয়ন এই নেই হবৱ দিল, “কি জেনি সাপ্পা এচে অফিসত এয়ে কিনা” বাঙালুনে ভিলে জদা অধন।” তুম-এ তা দরখাস্ত আন গমে দালেই ৱিনি চেল' আৱ এক পল্লা। পুৱোনান বাদ দি তে আৱ একান নুয়া গৱি লেগি আন্যে।

আদিক্যা গৱি বাৱ মিক্চে জগাৱ শূনি বেক মানুচ্চন সন্ধ বন্ধ অলাক। দেগা গেল' বুড়ুচেয়া মানুষ একো ধাবা দি-এযেৱ। মানযাৱ জদলা বুঅ আক্কাই গেল' তা মিক্চে। একজনে পূজোৱ গল্প, “কি হোয়ে, কি হোয়ে!”

ও ধে-দা ধে-দা, বাঙালুনে বুঅ মিছিল গৱি এতুন দে! ধে। মানুচ্চন' ভিদিৱে পৱানৱ ডৱ দেগা দিল, কাৱন বেঙ্কুনে পোড়া খেয়ে মানুষ, কমলছড়ি, ভূষণছড়া, লংগদু, পানছড়ি বুগতুন এয' দুক্যা মানযাৱ গঙানি ৱ' শুন' যায়।

তুম-ৱ যক্চে হ্চ এল', চায়দে মানুচ্চন ধাদন। তেও ধাবা দিল। কুন্দি ধাবা দিলে পৱান বাজে পাৱিব বুঝি ন পাল্ল তে। মানযাৱ জদলা যিন্দি যাৱ তে তাৱাৱেই হাদেল'। আক্কুৱি দিনত কুগি এ কাবা এলে চাঙমাই ধাবা দি পধ তোগে ন-পেদাক। সে ধাবা দেনা-ৱ কথা এয' বুৱ'-বুড়ি এ ঈধত তুলি পৰ্যান কোই দন। তুমতুন সে অভিজ্ঞতা ন-থেলেও ৮১ সালাৱ অভিজ্ঞতা আগে। ঈদত উদিল' সে দিন্যে আৰ্মি-বাঙালে যক্চে তাৱা আদামত আশুন বাজে দিয়ন সন্ধে দিস্কুল হাৱা কোই আদাম্যাউনে ভাৱতত ধেয়ান। গদা আদামত ছাড়া-নাদা হোই যেয়ে। কদ' গম গিৱিত্তি বলা মানুষ সে ছলাত ছাড়া-নাদা হোই যেয়ান দোই। তুমে-ও ভাৱতত লুঙঙে-গোই। সন্ধেও কোই ন-পাস্ত তাৱা ঘৱ মানুচ্চন কনে কুধু আগন। একমাস পর যক্চে শৱনাৰ্থী শিবিৱত দেগা অল সন্ধে দেগা গেল' তা-বাবে নেই।

তুমতুন সে কথা ঈধত উদি উগুৱি উদিল। পিঝেতুন ধৱ-ধৱ গোৱি ভালোক্কন মানযাৱ ৱ' শুন' গেল। আদিক্যা গুৱি তা হ্দতুন দরখাস্ত আন ঝোৱি পল্ল পধ উত্তৱে। তুলিবাৱ চেই নেই-অ ন পাৱল। পিঝেন্দি ধৱ-ধৱ ৱ'। মুজুঙে সয় সাগর মানুষ পৱান' ডৱে ধাবা-দেদন।

সঙ-মধ্যে তা দরখাস্ত আন পৱি-ৱল' আগাঝ' মিক্চে মু-গৱি। আদিক্যা গুৱি একো হিয়াংসিক ৱ-তুলি তে মু-অতুন “উয'-উয” ৱ-তুলি ঘুৱিনেই থিয়েল' লোড়ে আনদন-দে

মানুচুন' মিক্কে গরি । সকেনেই আগাঝ-পাদাল বিদির্ন গরি শত শত মানযার র শুন' গেল হেঁ -
হে ... । উয়'-উয়' ।

বেগ' মুযুঙে তুম-এ । বোয়েরত তা দরখাস্ত আন পত্ পত্ গোরি উরি যেদ'চার ।
চের' কিস্ত্যে মানযার জোঁতা-চেডেল-মিলে হাদি পরি আগে ।

তুম-এ আকোই যেই তা দরখাস্ত আন হাধত তুলি লল' । ৮১' সাল কথা ঈধত
উদিল' তার । সকেনেও তে ধেয়ে । বাব'রে হারেয়ে । ইকুণু তে আর কিছু হারেবার ন চায় ।

যারা লোড়ে আনদন, এধকন তারারে, পধ' সংমধ্যে তারাও থিয়ে পর্য্যন । একা
গোরি পিঝেন্দি যেবার লক্ষন' দেগা যার । তুম-এ আর এক পল্লা র' তুলিল-হে-হু-হু । সে
লগে হাঝার র' উদিল' হে-হু-হু..... ।

ঝিমদিত বাঙালুন' মিছিল সিত্তিরাং-ভিত্তিরাং হোই গেল গোই । তুম-এ তা
দরখাস্ত-আন তুলি নেই আর' একবার রেঙ কারি উদিল । সে সমারে শত শত মানযার রেঙ শুন
গেল ।

তুও দোল সরানান

ওজাকি কাজুইর

হেমন্ত কালর দাঙ-দাঙা রোদোর বেল্ দিবুস্যার ঘদনা। রেডিওত সকে বানাই উচ্চাঙ্গ সংগীদর অনুষ্ঠান ফাং ওইয়া। আদেক্যা গোরি তার ফগদাং (আবির্ভাব) অল'। কুতুন যে, এল - সিয়েন একান আমক অভার। বের' ধাঘত্ কী নাজনী মাগরক্কর।

গেল্লে চের বঝর ধোরী মুই এসান্যা বিচ্ছেন কামাজ্যা (শর্য্যাশায়ী)। সেরেউনে কেইয়ান গম অহলেও বেঙ্কানি এগন্তর গোরিনে ধোরী-নি পরে' - সিয়েনই একমাত্র জমেয়্যা বল্। জুরো বসন্ত পালাত কোই পার' গাওলী গম্ ওই উধিবের কন' ভ-ভাক্সা নেই। দিন দিন রদ্ পোয্যা ওই উধঙর। মুদা-মুদি ইরুক বিচ্ছেনত পোরি বেজ্ ভাগ্ ত্যামান গন্ডি যাই, উই আল্জি গোজ্যা ঝর' ফুদো থুপ্-থাপ্ র' শুনি। ম' ঘরর চাল'-দি যক্কে তারা আমেক্কন পত্তে থেবাক সকে বানাহ্ চেই থাং উ-ই-ই সে ঝর' নালুন'-রে।

উরি বেরান্নে পুগ-যুক্কনত্যায এ ব' বাদাজ অমহতা আগাত্যা ব্যাপার। তুও দ্বিবে উক্ক মাঝি দেঘা ন' যায় সিয়েন নয়। বের' মাধাত্ এবে রুও বাঝত্ ঘাঝি তারা বেই থান। রোদোর ত পেলেই তলে লামি এযন্। উরি বেরান - পাদিয়ে পাদিয়ে আ- বারান্ডায় বারান্ডায়। এবে সোই-ন' পারং মুই তারারে। তোয্যা গরন বিচ্ছেনত পোয্যা ম' সান্যা উক্ক জনম রুখ্যা বিত্যারে। কথা নেই বার্তা নেই এভাক বোজিবেক্কি, এবে মুওত্ ন' অহলে কবালত্। কী অ' হারেত্যা।

বেরানিত্ মুই মাগরক্কনরে দেঘং। তারা লাম্বা লাম্বা আহ্ধ থেং বাভেই বাভেই বেরান। অহলে দ্বিবে-তিন্নো অভাক। বেরানিত্ যুত্ত-সুত্ত্ তারা থান। প্রায়ই দেঘং তারারে। এক সমারে তারা ভেদা-ন' দোন। নজরত্ পলেই কোই দি পারং তারাত্তন কুভো এল'। তাজ্জাক কারবার গোরিল' যে মাগরক্ক, সিভে অহত্তে বেঘর চিগোন্।

রেডিও অনুষ্ঠান ফাং অভও মুই বুঝং সিভে মর খুব্ চিন পয্য গীদ্। গীন্তর রেকর্ডও মর আঘে। সুরর মিধে রয় মুই সকে গোলা পোয্যা (মোহিত)। আদেক্যা গোরি ঝুরনি এল' মর' রিমিঝিমি চোগোদি। চা-গেল', সিয়েন এক আমক কাভ। বের'-দি লামি এযের উই মাগরক্ক। তেহ্ সেবেদেন এক থেং-দ্বি থেং এ্যাহলেই-উহলেই আর' তলেদি লামি এত্তে তা-গোদা কেইয়্যা নাজর ভংগিয়ে তুভোল তুলের। ইয়েন যে ঘেস্যাক নাজ্; সংগীদর তালে মাগরক্কর নাজ। হাক্কন ভাবিলুং। ইয়েন কি সদ্ভব! আজলে মাগরক্ক ঘেস্যাক গোরি ন' নাজের। এ্যান-কি সংগীদর সমারেও তে ন'-নাজের। আজলে তে-উই জাগুলুক্যা জাগাত্ পোরি হিঝে-হিস্যো ইন্দি-উন্দি আহ্ধি বেরার। মুই গীত্তো শুন্নে শুন্নে এ্যান্ অক্তত গম্-ন লাগি মনান ফুজুক-ফাজাক ওই এযের। মনিষ্যরর গীদে মন্ গলদে' শুনাং গুরু আর কুন্তর'রে। এ্যাহ্ন-কি মুই নিজেও দেখাং কুন্তরে গীদ শুনি খুবী অহ্ধে। আর মাগরক্কনে গীদ শুনি খুবী অহ্ন ইয়েন কেজান্যা কথা। ইয়েন যেন বিশ্বেসই ন' অহ্ৰ; না এক রেনীয়ে মুই মাগরক্ক হেত্যা চেই রলুং। গীত্তো থুম ওই

গেলে তে-কি গরে, সিয়েনই মর জানিবের কহর। গীতো থুম অল'। মাগরক ও আদেকা গোণ থামেই আর কন' র-শুনি ন' পেই কেইয়ান ঘুরেই তে নয়দ্যা সান জুইচ গোঁরি গেল'গোষ্ঠ।

মাগরকুনে সালেন কি শুনন? হালিক মর জানা নেই। এক খেপ উক্ক ষ্ট পিঁপু। পুগ্ -যুগর শুনার উগরে। হালিক ইধোত্ ন' উধের এসান্যান কধা। এ্যাহ্ন কি- মর জানা নেইদ্যা শুনিবের শুক্তি ন' খেলেও তারাতুন এ্যাহ্ন কদকানি ইস্ত্রীয় আঘে কি-নেই, যিয়েন দিনে তারা শুনিবের ধগ্ জিনিজরে ইধোত্ (উপলব্ধি) গোঁরি পারন। ইয়েনীর পোইদ্যানে মুষ্ট এপে কোগেয়া ভুল।

আবাধা জিনিজ মুই দেলুং, তারে মনতুন ধাবেই ন' দি মর এক বিদঘুদ চিন্দে এল'। দে মাগরকরে কন' মদেই চিগোন গোঁরি দেঘা ন' যায়।

এক দিন্যা মুই মাগরকরে কন' কিছু কাবুক এ্যাহ্দি ন' পাদি হাক্কনতায় উক্ক মাগরক ধোরী পেলুং। সেক্কে গরম কাল্যা দিন্, সেক্কে মুই কিছু গম্ এলুং। থিয়েইন্যা আহ্ধা-উহ্ধো হাক্কন হাক্কন গোঁরি পাতুং। এ তেমান বেগতুন বেজ্ মুই বল্ পেইয়্যা পাং। মর উক্ক চুধো বধলর দরকার অল'। দোল চেই উক্ক বেই লোলুং। বধল্ল মুওন খুলি হাক্কন পর উক্ক মাগরক নিঘিলি এল'। দ্বি-এক ইংসী লাম্বা অভ'। ম'-ঘরত যেদকুন মাগরক আঘন, তারাতুন বউত চিগোন। তা-গুল কেইয়ান মনে অয় যেন কাজা এহরা সান্ ওই যেইয়্যা। ইধোত্ উধিল' মর। বসন্তর পত্তম'-দি পুও-ঝিউনে উই সে বধলুন ধোইনে কুন্দরী উভোদ গোঁরি থোয়ন। চুগনার পরই সিউন বাকসুত ভোরেই রাঘেয়ন এ্যা-সক্কেই জু-পেই বধল্ল ভিধিরে সোম্যা। মর হিয়েজে লন্তে নিঘিলিবের পত্তান নাদা যানার পরই মাগরক ভাপ্যা তে-কিঙিরি নিঘিলিব'। কয়েক দিন বিদি যেই অহ্লে পেদ্ পরাই আহ্লেম্যা ওই তে যেবার পত্তান তগাদে বুদ্ধি নিঘিলিবের বাচ্ছেই রোয়্যা। মাস্তর সে বধল্ল ভিদিরেতুন নিঘিলি এবার ব্যাখ্ চেষ্টানি সুম-সুম বরবাদ অনাই ব্যাখ্ সংগ্রাম ইরি-দি সুযুগর আব্বায় থানা ছারা কী ওই পারে। মনে অহ্য কম অহ্লেও ছয় মাঝ্ কাদি যেইয়্যা। এক দিন মুই সে বধল্লর ধিবোবো খুলনাই তার ধেবার জু এস্যা। সেক্কেই ধাবা গেল' যেন ধাবা দিয়ে ফিবগত্ তে দিয়েন থেং আক্কে আক্কে বাভেই আঘে।

এসান্যাই আর' একান ঘদনা। ম' ঘরত্ দগিনে বারাভা পজিমে-দি গাদনি রুম। তা-উজু গোঁরি সেই পজিমেদি রেনী চলে দেঘা যায় ফুজি মুরো। সিয়েন চেই চেইও আলসী মনান কাদি যায়। সেই জানালার চিবে সেরে দেলুং উক্ক মাগরক থেক খেই আঘে। কন'জনে অহ্লে মুইও ওই পারং গেলে কেল্যা জানালাবো বান'-দে এ কাভয়ান ওই যেইয়্যা। মাগরক বেগস্যা জাগাত আঘে, অবশ্য ইজো চিবে ন'খাই। যে জাগানত্ থেগ খেই আগে সিয়েনর মধ্যে এ্যাহ্ন ফাঘা অবস্থাত এল'দে সিয়েনদই ধোরী তে খুব গমে ধুলি ধুলি আঘে। আর কন' হেত্যাৎ পদই নেইদ্যা যে, ধেইনে বাজি পারে। ম' ঘরত যেদকুন মাগরক আঘন তেও তারার দলর। সেক্কেই বধল্লত থেক খেইয়্যা সেই মাগরকর ঘদনা ম' মনত্ উধিল'। মন্তুন বানা ভাবনা এলদে জানালাত্ থেগত্ পোয়্যা মাগরকরে দেঘা যোক না, তে এ্যানে কয় দিন বাজী পারে। মুই বেকুনরে কোই দিলুং জানালাবো যেন কিউয় লারা-চারা-ন'গরন। বধলত্ থেগত পোয়্যা সেই মাগরক প্রায় দ্বি মাস কিছু ন' খেই বানাহ্ ধিবে সেরেধি সোমেয়্যা বোয়েরান খেই বাজের। এই

মাগরক্ক-দ' আর' দাঙর, আর' দাঙর তেল্‌তেল্যা। সালেন দেঘা যোক না সেয়ান্যা গোরি কতমান বলদিনে বাজি খেই পারে।

সেই জানালার সেরে ফুজি মোনুরে মুই নানা ত্যামে নানা ধঘে দেঘং। তার সেই ধগ্ বদলানি নানা বাবদর। দিনত্ ফোত্‌ফোত্যা ব'-বাদাজত্ তার যে ধগ্ মুই দেঘঙ সিয়েন একাও চিদ খোজোরেবার নয়। মাত্তর গভীন রোদোর পাসুঝীর রিমিঝিমি পহরর সদগে ইনঝীব ওই যক্কে ফুজির মেলি দিএ্যা ইধ্ জুরনীর ছাবা, উই সে জানালার সেরে যক্কে নজরত পরে সক্কে মুই পানিত ভাঝা ভাঝা।

আর' কবাউনে দোগোরী উত্যা পোত্যা আমল্যা যক্কে তারাইনে বল পোরি নাদা যেই রিমি-ঝিমি সদগ্ সিদেনতুন থুব ওই এব' ফুজির মাধাত সক্কে ওলোত্যা আভা পোরাক পোরাক ওই উধে এসান্যা দৃশ্য সেরে মুই বানাহ্ খেইয়্যা মাগরক্করে দেঘং। সে জাগাত ইনঝীব ওই আঘে। আর' যেন মনে অয় মুরো উত্তরে তে। মুরো উধি তত্তনত উধিবের চাহর। আজলে তে একাও ন' লরের। সক্কেই যে তারে বাহ্নি রাঘা ওইয়াদে এ্যা সিত্তন ধোরী এক খেপ্‌ও আহ্‌ধ থেং ন' লারে। এসান্যা গোরী বেঙ্কানি দেগদে দেগদে এক খেপ মুই ইহ্ল ফুরেই এসান্যা ভাবনাত প্রায় বিজিত্যা ওই উথাং। আওঝ গরে জানালার একা কাই যেই তারে কং -

: তুই ইক্ক অজ্ঞান ওয়োস্‌ কিত্তে? এসান্যা বানাহ্ খানাত্তন তুই চুগেই তক্‌তা ন' অহ্‌র কিয়?

প্রায় মাঝমুলো পরে দেলুং ঘেস্যাক অয় মাগরক্ক কখ্যা ওই উধের। ম' মোক্করে কিজেক কারি কলুং-

: ইয়ো চেই যাদেই, উই সে জানালা সেরে বানান্ খেইয়্যা মাগরক্ক লারে গোরী রদপোঘ্যা ওই উধের।

ম' মোক্ক সে জোবে কল' -

: অয়নি সালেন! আহা বেজেরা!

: তুই কোই পারজ-নি, মুই চেধুং চাং উক্ক মাগরক্ক কয়দিন ন' খেই খেই পারে।

: মর সদক্কানি আওঝ নেই।

এসান্যা গোরি তে কাধায়ান কলদে যেন মনে অলদে এই সমস্তনিত্ তার কন' লালোজ নেই। তার পুজু পুজু কধায় কিজু অগমান এল' চিগোন চিগোন বেপার-সেপার নিনে চিগোন মনেই চিন্দে ভাবনা গরে। আর উই সে মগরক্কত্যা এসান্যা এহ্লাপেলা একাও আহ্‌ঝি ঠাত্তার পোইদ্যান নয়। মুই উত্তদো অগমান পেই কলুং -

: সেনত্যা ভিলি তারে তুই ইরি ন' দিজ্। তেহ্‌ সেবেদেন দ্বি-সাপ্তা পর মাগরক্কর ঘেস্যাক অয়, অবস্থা ইলেপাদারে ওই গেল'। তার ধগ্ বদরি গেল'। এই ঘদনার পরেদি দ্বি-মাঝ পার ন'অধে বেরানিত মুই যক্কে অন্য মাগরক্কনরে বেরাদে দেলুং সক্কে আদেক্যা গোরি ঝবাদত্ ম' মোক্করে আবাদা কিজেক কান্তে গুনিলুং -

: ইয়ো চেই যা-দেই। হাক্কন জুরো ওই আর' কল' -

: মাগরক্ক ইত্তুন যেইয়্যা। মুই আমক ওই ভাবিলুং অহ্‌লে ম' মোক্ক তারে ইরি দিএ্যা। এই পোইদ্যানান ঘেস্যাক অয়, মুই কিচ্ছু মনে ন'গোলুং। সেনত্যা তা কধায় কিচ্ছু নও কলুং।

ম' মোক্ক এই কলগী -

ঃ চুরি ফেলাদে পোজ্ পোজ্ সোজ সোজ্ গোরি মুই জানালাবো বেগাও আঁখ
বাবেলুং। যেনে মাগরক্ ধেই ন' পারে। হালিক এস্যা এক্কা বজং গেল'। সে জানালাবো
দোরিয়েন ধোরী টানদে এক্কা আঘালাক্ অল', মরে বজং বুজিবের আগেদি যদি তুই চেদেগোষ্ট
সালেন বুঝি পাল্যান, কী ধাবাত্ তে নিঘিলি গেল'। মনে অল' এই সরানান্ তে এধক্ ভিলোন
বাচ্ছেই আঘে।

মোক্কর এধক্কানি কথা এককানে শুনঙর আ অন্য কানে নিঘিলেই দোঙর। ইনঝাণ
অলুং হানেক্কন সেই মাগরক্করে বাজি থেবার কবাল তার সালেন জুদিলো। আজলে বধর
পরীক্ষাত্ আওল-ফাওল ওই ম' ইধু যে হানেক্কন অসুনজুক ওইয়া সিয়েনও এচ্যা থুম ওই
গেল'। থুমেদি মর বরলর পরীক্ষার জিদে জিদিৎ বাগ ধুঝিল' এসান্যা গোরী। মর কিচ্ছু কবার
থেলে ইধুই মর পাত্তুরুতুরু দেঘেবার আওঝ গরের।

[জাপানী গল্পবুয়্য চাঙমা ভাষায় অনুবাদ : লুগ্‌চান চাঙমা]

গদারামর স্ববন

শান্তিময় চাকমা

কালাম্যাত্তন এক পেঘেত ফাইভ ষ্টার চিঘিরেত বিজিনেই নুয়ো দ্যা দগানানতুন মাল-মাত্তা পাত্তরুতুৰু গরি বেজানা ফাং গল্যা গধারামে। নুয়ো আন্যাহ্ মাল-মাত্তানি এভ' সং সম্বরানা ন' অয়। সিয়ানি কিত্যা চায়দে বেঙ্কানি দগান' এক কনাত সেন্তোরা গরি আঘে। ইয়ানি-দ আগে নকভাজ গরি সম্বরানা দরকার - মনে মনে ভাবিলো তে। ভাবানা সমারে সমারে মাল-মাত্তানি গুছো ধল্য। পান-সুবোরী, বিড়ি-সিঘিরেত, চমকঘর, সাগোন, তুমবাচ তেল' শিঝিরি, ফুনি, মুমবাতি, লেবেনসুচ, ফগনা বেঙ্কানি যারে যিযোত থবার থুয়ো ধল্য। "আগে-দ কিবু খানা দরকার" জীনিচ পাদি সম্বরদে সম্বরদে ভাবি চেল' গদারামে। বেইন্যা পোত্যা ঘুমতুন উধী মন্তন দগানত এযানাই ঘরতুন কগরা ভাদ-অ খেই ন তাঙরে। গেল্লে রেদোত খেইয়্যা ভাতুনো মাল-মাত্তা সম্বরদে সলাত ভ্‌ যে ফুরেইঅন। ইন্দি ধাগেদি চা-দগানতুন গরম পরতার সুদ্যাবাচ পিরপিজ্যা বুইআরত ভাঝি এঝের। পরতা বাচ পেই আর' বেচ নোনেইয়্যা গরি গুজুরো ধল্য তা পেত্তো।

এ অবস্থাত কি গরাহ্ যায় ভাবি চেই ক্যাশ বাস্তুবো কিত্যা এক্কা রিনি চেল' গধারামে। চায়দে বানা পাচ তেঙা চেরানা বেজা অইয়েদে। পরতা আ চা খেলে তিন্নো তেঙা শেচ অভ', আ ন' খেলে-অ পেত-পরাই মাল-মাত্তা বেজানা কিত্যা মন দি ন' পারিবো। আর' ভাবি চায়দে - পোলিম মাল বিচ্যো তেঙা; আগে-দ কিয়ঙত গোজেন'রে কিবু গজানা দরগার। যেদক ভাবের সেদক তার আনুদর লাগের। শেচমেচ ভাবানা বাদ দি দিভে চোখ খাদিনেই বোছ্যাবাদে দগান' বারেদি গন্তনাবো বাবেনেই চা-দগান' বয়বোরে পরতা আ চা আনিহ্ দিবের হল'। হাক্কন বাদে জাঙারে দোঝো তোনো পেলোদোত গরি গরম ভাব উজ্যা পরতা আ কাজ'রে ঘেরেঙ বান্যা ভাঙা কাবত গরি চা মুজুঙোত ভেক গরিহ্ থোই দিলোঘি বয়বো। পরতা চাবাদে চাবাদে মাল-মাত্তানি গুছ্যা ধোল্যো তে।

নক ভাচ্ গরি মালমাত্তানি গুছো ফুরেই সিয়েনি কিত্যো হাক্কন নি-আলঝি গুরি চেই রল'। চায়দে - ওন্যো দগান' সান এদক দবদবা ন' অলেহ্-অ চেই থাক্কে সেদক বজং ন লাগে। ভালক দিনোর হাউচ পুরই পারি খুঝিয়ে মুআন তেরেছ্যা গরি ভেগেদে এক্কা হাঝিলো।

গধারামর এক্কান দগান দিবার হাউচ ইচ্যা-কেইল্যার নয় কধ' চলে ভালক দিন আগর। তা দি চোঘো তলে বাহরেতুন কদ' মানুচ এই দগান দি-দি কবাল ফিরেলাক তার গনা-পরাহ্ নেই। দগান দিবার হাউচ তার বেচ ওইয়ে কালাইয়্যারে দেনেই। বঝর তিনেক আগেন্দি যেক্কে তে ইচ্ছে সেক্কে কিয়াত কধে তার কিচ্ছু ন' এল'। বানা তালি দ্যা ফাদা একখান লুঙ্গি আ ফাদা ইক্কো গোন্জি, সিব-অ কাজ'রে সুদোনাল চিন ন' পায়। সিব পোলিম গুলোদক সুন মরিচ বেজ'দে বেজ'দে ইচ্যা এক্কাবারে লাখপতি। সাত-আটোআন বর বর দগান, সেবারা ভুই ফিনি ঘর শাক্কা গরি ইঁক্কুশু এক্কাবারে কদ' চলে ভাদে-কাবরে দবদবা। তারে চেই চেই গধারামে হামিঝা ভর্বি-দো - তারাহ্ পান্তে আমনে ক্যা ন পান্ত, ভাব'দে ভাব'দে শেচমেচ তিনকুনি ভুই

এল্দে সিয়ান আ শুরু জরাবো বিজিনেই তেঙার যায়-যুকোল্ গরাহ্ ধল্যোতে। তেঙা যুকোল্ অইনেই-অ বাজারত একান দগানর পুট জুদোদে কম তেঙে খেই ন পায়। বাজার চুধুরীবো চাঙমা হ্লে কি অভ' - চাঙমাউনোস্তুন তার ওন্যোইয়ুন বেচ সদর। সোদোছ্যা হ্নার করম-অ আঘে। চাঙমাউন দ কন' বেচ তেঙা পোয়ঝে ঝাবেই ন পারন। সেঙেই তারারে ন দিনেই ওন্যাইউনরে দেনা বেচ লাব। শেচমেচ চুধুরীরে কধক কোঝোলী গোরিহ্, শুত্তরো শিরা আ মদ বধল গোজেন'রে হাদ জুর গোরি গোজেই দে পা গোঝে দি কন' বাবদে একান জাগা যুধেইয়ে, সি ও আর' বাজার' এক কনাদি, কামাহ্ কাজাত। সেঙেই তার মনত্ দুক নেই; জাগাআন পেইয়েদে সিয়ান-অ সয়-সাগর কদ'জনে চেরেচতা গরিনেই-অ ন পান। সেঙেই তে-যে পেইয়ে, সিআনো কদ চেলে কবাল' জোরে পেইয়ে কুয়োহ্ পোরিবো। বিদি যিয়া সে দুঘো কধা ইধোত উধি ইক্কো ব' নিঝেচ ফেলেল' গধারামে।

“ইয়ান্যো ত-নুয়ো দ্যা দগানান, গধারাম?” মানঝো র শুনি মুঝুঙেধি চেল' গধারামে। চায়দে আদাম' কারবাজ্যা মুজুঙোত থিয়েনেই দগান' মাল মাস্তানিহ্ কিত্ত্যা চেই আঘে।

“অয় দা”।

“অ, আ-দ দোল দগান দ্যোচ। একা দি পেকেট সিজার চিগেরেট আ সোলোই একান দে-ধে। হালিক ইচ্যা-দ তেঙা ন আনং, কেইল্যা লোচ”। চিগেরেদো পেগেস্তুন আ চমকান জেবত ভোরে ওন্যা কিত্ত্যা দি হাদা ধোল্যো কারবাজ্যো। গধারামে কিছু কবার চেইনেই-অ কিছু কোই না পাল্য আর। কারবাজ্যো ধুব কেরোলিন কাবর' সিলুমো জেবত রাঙাগরি পঞ্চাচ তিক্যা নোট্ দিঘিনেই-অ তেঙাউন মাঘিবার সাহঝে ন কুলেল তার। কারবাজ্যোর যানা কিত্ত্যা হাক্কন চেই মাল বেজানা কিত্ত্যা মন দিলো আর' তে।

গদা দিন্নো মাল বেজ'দে বেজ'দে চেরোকিত্ত্যা দি সাঝ ঘোনেই এল। মাল-মাস্তা বেজা হেমাদি ইক্ক লেফ্ ধোরেনেই তেঙাউন ইঝেব গরাহ্ ধেল্যো তে। গদা দিন্নোত একশ নব্বই তেঙার বেঝা অইয়ে - সিত্তুনো চোল্লিচ তেঙা বাগি আ দেরশত তেঙা - লগদ। বেজা দাম, কিনে দাম বেঝানি তলবিচ গুরি চায়দে ৫০ তেঙা লাভত রোইয়োন। একদিনে ৫০ তেঙা লাভ অলে একমাঝে দের হাজার তেঙা, বঝরে আদার' হাজার তেঙা লাভ। তেঙাউন হাধত লোই ভাব'দে ভাব'দে রংচোঙ্যা স্বভ'নত দুবি গেলগোই গধারামে। “বঝরে আদার' হাজার তেঙা লাভ - সিউন ন খেনেই কুম বারেলেহ্ তার জের বঝরত চোব্বিচ হাজার লাভ, আ সিউন ন খেনেই তার জের' বঝর আর' বেচ লাভ” - এসান গরি হাঝার হাঝার তেঙা ভাঝি উদিলো দি চোঘোত তার। সে সমারে ভাঝি উধিলো দুন-কে দুন ভুই। ঝাক-ঝাক মোচ-গুরু আ সে সমারে রাঙামাত্যাত একান দবদবা গরিহ্ পাক্কাঘর যিয়োত কেসেট আ টেলিভিশন থেব, আ সেবারা।

“বনা বনা তেঙা হাদত লোনেই কি এদক ভাবর, ঝেদোরী বাব ?” আবাদা গরি মেরেইয়ে বাবর হাঝা হাঝা র' শুনি রঙচঙ্যা স্বভ'নানি বারিঝা রানজুনিহ্ সান মিলেই গেলগোই গধারামর দি চোগোস্তুন। চায়দে মুজুঙেধি মেরেইয়্যা বাব, বদাচোঘি বাব, হামুয়ো আ পুনং চানে থিয়েই আঘন।

“নুয়ো দগানান দিনেই-দ সংসমাজ্যাউন পুরিহ্ ফিল্লোচ অয় ?” দগানত বোঝিনেই চিগেরেদো পেগেদোস্তুন চিগেরেট ইক্ক লধে লধে পুনং চানে কল'।

“আ-কি পুরিহ ফেলেইদুং। ইচ্যা দিন্নো এক্কা ঝামেলাত ইলুং, এ সেত্তেই ”
গধারামে কধাআন থুম ন গত্তে হামুয়ো কধাআন কারিহ্ নিনেই কল’ - “থোক থোক সিয়েনি
এমেন জেরেদি শুনিবোং। নুয়ো দগান দ্যোচ, কোই চিগিরেত খাবা।”

“চিগেরেত্তেই কাম অধ’ নয়। ইচ্যা গরমপানি খাবা পুরিবো।” আরকজন কল’।
আহা, খেবাআই, এধক কি, তারে আগে কধা কভার দ্যো-নাহ্।” বেঙ্কুনো কিত্যা চোক জ্বোলে
চেই গধারাম’ কিত্যো ফিরিলো বদাচোঘি বাবে।

“তে- ইচ্যা কেযান বিজিপাল্যো, ভেইধন ?” গলাহার মারিনেই পিঝের গোলা
বদাচোঘি বাবে।

“কুধু, বেচ নয় বুঝোচ, ভেই - বানা দশ কম দিশত তেঙার।” গধারামে জ্যোব
দিল।

“বাপরে বাপ! দিশত তেঙার!” বুক চাবেরেনেই ফাল্যো উদিলো হামুয়ো। “এঝান
গরি বিজিলে-দ এক্কা বঝরে তুই পাক্কা ঘর তুলিবে।

হামুয়োর কধার ধক দেই বেঙ্কুনে কাক্ কাক্ গরি হাঝি উদিলাক।

“ঝেদোরী বাব ভাই, ইচ্যা চুচ্যাং মুয়োরেখাবা”- এক্কা গধারাম’ কায় এনেই কল’
বদাচোঘি বাবে।

“না! ইচ্যা নয়, কিয়ঙত অভ-অ বাত্তি আঙানাহ্ ন অয়।” তেঙাউন জেবত ভরাদে
ভরাদে জোব দিলো গধারামে।

“ধুত্ তর বাত্তি-তত্তি গুলিমার। ইচ্যা খাবা পোরিবো ভাই।” পুনোং চানে কল’।

“কুলুং-দ ইচ্যা খাবেই ন পারিম।” কধে কধে দগান’ দোর-দার বানিবাল্যোই তালা-
চাবি হাধত লোনেই থিয়েল গদারামে।

গধারামর ধকান বুঝি পারিনেই বেঙ্কুনে দগানতুন নিঘিলি কানে কানে পুজুপুজু গল্লাখ
হামুয়োদাঘি। তে- বদাচোঘি বাবে গধারাম কায় এইনে কল’ - “ভাই, দগানান ঝাদি-মাদি
বানিল। ভুই-দ ন খাবেবেদে দেঘঙর। থিক আছে, তুই যেক্কে ন খাবর, ইচ্যা ঝমি বেঙ্কুনে মিলি
তরে খাবেবংগ। গধারামর কিত্যা’ চেই বেঙ্কুনে সুর গরিহ্ কলাখ।

“নয়, ভেইলক, মুই ন খেইম। গেলে সাগুত শমক্ খিয়েং-মদ ন খেইম ভিলি।”
তালাবো মারিনেই চাবিআন কমরত গুচ্ছেদে-গুচ্ছেদে কল’ গদারামে।

“থিক আছে। ন খেলে ন খেবেদে আই! তুই বানা আমারে মুয়োরেখাবে অভ-অ।”
কমরতুন ফুনিআন নিঘিলেই শিরেবো আজুরোদে-আজুরোদে কল’ হামুয়ো।

“নয়, মর ঝাদি-মাদি ঘরত যা পোরিবো, ইচ্যা মুই খেই ন পারিম। তুমি য’।”
গধারামে কল’।

“আহা বেচ দিরি ন অভ-দ। যেবং, এক কাবত দর ঘুতঘাত্ গিলিনেই বেঙ্কুনে
ঘরমুখ্যো হাধা ধোরিবোং। আয়।” কধে কধে হামুয়োলোই মেরেইয়া বাবে বাজার’ মাল্
কিত্যা গধারামরে তানি নেযা ধ্যোল্যাক।

“না! তমাল্লোই ন পারিবোদে। থিক আছে, যেই। হালিক মে ন’ যাচ্য-মুই খেই পাত্তুং
নয়।” কোনেই হামুয়োদাঘি সমারে হাধা ধোল্যো গধারামে।

বাজার' এক কনাদি মাল্যার মদ' দগান। ইচ্যা ভালক বঝর ওল তে মদ বেজেতে। গধারাম আ তা সমাজ্যাউন মালত বোই কদ'বার যে মদ খেইয়োন, মাস্তল ওনেই তারাহ্ তারাহ্ মারামারি গছ্যোন তার গনাপরাহ্ নেই। আন্ত্যা দচদিন বাদে ইচ্যা মাল্যাহ্ ঘরত এনেই গধারামর মনে অন্তে যেন কয় বঝর বাদে ইচ্যা ইছে।

যাই ওক, সমাজ্যাউনো সমারে মালহ্ ভিদিরে দিভে হুদো উত্তরে পেরাক মাচ্যা বাগালাত বোঝিলো গধারামে। তারারে দেই মাল্যাহ্ ইক্ক মদ বধল আ পুরোন কাজা ভাঙা, দাদি ওঝোরিহ্ যেইয়্যা পাচ্যা কাব আনিনেই ভুক গরি তারাহ্ মজুঙোত থোই দিলোঘি।

বধল্লো লোনেই পাছ্যা কাবত সং সংগরি ভাগ গল্য হামুয়ো। তে .. ইক্ক কাপ গধারাম' নাগ' কুরে বাচ পাং পাং গরি রাঘেনেই কল', "দগানদার সাব, যেক্কে তুউ শমক খেইয়োচ কর সেন্তেই বানা দি আঙুল গরি তরে দিলুংগে, ধর।"

"নয়, হামুয়ো ভাই, মুই-দ ইধু এভার আগেশি তমারে কোইয়োং, মুই ন খেইম বিলি।"

"সেন্তেই-দ তরে বানা দি আঙুল গরি দিলুংগে, ন খেলে এক্কা গরি অলেহ্ জিলোত বা-ঝা।" বর ইক্ক ধুক খেই চোক ইক্ক খাদিনেই কল' মেরেইয়্যা বাবে।

"দগানদাচ্যা মদ'দামুন দিপায় ভিলি দরান্তে পারাপাং, চিদে ন গরিচ ভেই, মদ' দামুন আমি দিবোং।" তা ভাগ-অ কাপ্পো উবোত গরি খেনেই কল' পুনোংচানে।

"ইয়ান-উভোন ন ভাবিচ ঝেদোরি বাব। জনম-ভরা মাল্যাতুন মদ খেলংঘে; ইচ্যা ইয়ান সান তংগা মুই কনদিন ন পেলুং। এক্কা গরি খা ভেইধন, চিত-অজভ' বেক জুরেই য়েব।" থাঝি এক দুক খেই কল' বদাচোগী বাবে।

"নয় ভাই, ইচ্যা এব্যোরে ন অভ'-দে।"

"থিক আঘে, ন খেলে ন খেবেদে আই, তে .. এদক যক্কে বেক্কুনে কোভেইশী গণ্ডন, এক্কা গরি অলে মাধাত ল'।" গধারাম' মাধাবো পুছোই দেদে-দেদে কল' বদাচোগী বাব।

"আহা, তুমি বর মে তুছ্যা গরিবাদে, তমাল্লোই না পারিবদে।" মোনেই এক টু; কাপ্পো উবোত গল্য গধারামে।

সং সমাজ্যোমায় বেক্কুনোত্তুন বেচ খেই পারেদে গধারামে। সেন্তেই বেক্কুনে ত'রে ন' বোঝেই দ্যোন "মদ-জুং"। এককাপ খেই আবাদা গরি পুরোন মদ' তিরোচ্চান ক'দং গেল' গা' গধারামর। গধারামর মদ' কাপ খালি অইয়ে দেনেই আর' এক বধল অর্ডার দিলে। বদাচোগী বাবে। কাবত ঢালি দে-দে সলাত মানা গরি ন পাল্য আর গধারামে। সে বদল্লো উবোত অল'। তে .. আর' এক বধল অর্ডার দিলো পুনোংচানে। সে বদল্লো থুম অধে অধে বেক্কুনোর মাধা এক্কা ঝাজে উধো ধল্যো। হাক্কন বাদে পুনোং চানর কিন্যা বধল্লো-অ উভোত অল'। গধারামে মাল্যার পুনোং চানর কিন্যা বধল্লো-অ উভোত। ধার উভ্যো যক্কে যে কন' বাবদে খা পরিবো তার।

"কিচ্ছু নেই গরি আমি তিন বধল খাবাদে, দগানদাচ্যা দি/এক বধল-অ খাবেই ন পারিবোনে, কি কচ বদাচোগি বাব।" সমাজ্যোউনে মুখ্যা চোঘ উক্ক খাদিনেই কল' হামুয়ো।

“কন্না খবর পায় সিয়ান-দ দগানদাচ্যোর সেদামতুন কথা । সেদাম থেলে খাবেব, আ সেদাম ন থেলে-দ সিয়ান অন্য কথা ।” - চোঘো লেখদি গধারামরে একা রিনি চেই কল’ বদাচোঘী বাবে ।

এনে-অ তিন/চার কাপ খেই গধারামর একা একা ধোচ্যোঘি, সে বারাহ্ সেদাম ধুরি বদাচোঘী বাবে কথা কনাই জিত উধি গেলগোই গধারামর ।

“আ-ক্যা খাবেই ন পান্ত, কোই মাল্যা, একবারে দি বধল আন ।” মুঝুঙ বাগালাআন চাবেরেনেই তেঙা বাভেই দিনেই কল’ গধারামে ।

হাঙ্কনবাদে সে দি বধল-অ উভোত অল’ । তা জেরেদি আর’ দি বধল । এসান গরি কয় দি বধল আ কুধুকো তেঙা যেবতুন মাল্যাহ্ হাধত গেলগোই তার ইঝেব নেই । শেচমেচ আ এক বধল খেবাতেই জেব বিজিরেই চায়দে জেব শুন্য । জেবত কন তেঙা ধুরি ন পেই আবাদা গরি মদ’মাস্তল ছারি গেলগোই গধারামর । জেবত বিজিরে চায়দে বানা ইক্কো চেরানি । বেক তেঙাউন কনাত্যো মাল্যাহ্ইধু যেই তাঙোচ্যোন । চিত্-ওঝোরেই যেইয়া ইক্ক ব’ নিঝেচ এল’ গধারাম’ বুগো ভিদিরেন্তুন ।

এদক হাউঝোর দগানর পোলিম মাল-মাস্তা বিচ্যে তেঙা যার এক পোইঝে-অ গোঝেন-রে গোঝেই দ্যা ন অয়- সে তেঙাউন বেঙ্কুন যে এযান্যা গরি বেনালে যেবাক সিয়ান একা আগেন্দি স্বভনে-অ ভাবি ন পারে তে । সমাঝ্যোউনে কিত্যা চায়দে বেঙ্কুন শুণুরো সান মদিদিত গোচ্যাদন । মাস্তল ওই সংসার’ খবর ন পান আর । কধক হাউচ এল’ তার ন খেনেই লাব’ তেঙালোই তে কুম বারেব’ । হালিক লাব’ তেঙালোই কুম বারানা-দ বাদ, আঝল তেঙাউনো আ-পানি ধাল্যাগরি ছারানাধা হ্লাক । ইক্কু কি গরিভো কন’ কিঝু ভাবি ন পাল্ল আর তে ।

“ও বদ্দা, ন খাইও আর । আজিয়া যওগোই । বেশী রাইত ন অয় ।” - কানজাবা কুরে মাল্যার র-বো শুনি তা কিত্যা ফিরি চেল’ গধারামে । চায়দে উঝ্যা গোনজিবো ভিদিরে তেঙাউন খোনেই বধল আ কাঙ্কুন সম্বরা ধোঝ্যে মাল্যা ।

খেই ন’ পেইয়ে চিলে কুরো-ছ কিত্যো যেয়ান্যাগরি চেই থান, মাল্যার গোনজিবো ভিদিরে তেঙাউনো কিত্যা-অ সেঝান গরি চেই রল’ । চেই থাক্কে থাক্কে তার মনে হন্তে তেঙাউন তা মুখ্যা চেই চেই কাক্ কাক্ গরিহ্ দাত ভেগেদে ভেগেদে হাঝদন । সহ্য গরি না পাল্য তে আর । মাধাবো চিবি ধরি কন’ বাবদে মদ’-মালতুন নিখিলি এল’ । বারেন্দি ঘুরঘুঝ্যা আন্দার । সে আন্দারত মনে অন্তে কন্না যেন্ তারে চেই চেই কাক্ কাক্ গরিহ্ হাঝদন । সে হাঝানা র’ শুনিনেই দি চোঘোত ভাঝি উদিলো গদা দিন্নোত মাল-মাস্তা বিচ্যা দশকম দিশত তেঙা, যিউন ইক্কুনু মাল্যার কাজর গনজিবো ভিদিরে দলামঝা গরি আঘন, যিউন সিতুন ইক্কুনু তারে ভেংসি দেঘাদন, তারে চেই চেই কাক্ কাক্ গরি হাঝদন ।

বুচ পেলে ?

সুনির্মল চাকমা

কন' একান আদামত এল' একুয় রাণী মিলা। একুয়' পুয়' একুয়' ছি। তা নেগর সোম্বোতিলোই উদোর-ধার নেই গরি নাদুকতুক গরি তা দগে তে চলের।

একদিনে তা ঘর' দুয়োরত য়েই - গিরোচ ও গিরোচ গরি একুয়' মানজো দাগের। দুয়োর খুলি দিল' চা-চি হ্লাক, হালিক চিনে-চিনি ন' হ্লাক।

গিরোচ : (রাণীমিলা দুয়োর খুলিদি) আঃ ন' দ' চিনঙর, কুতুন ? উত্তিনা, বচ্চি।

গরবা : কিচ্ছু মনে ন' গোচ্য। মা-লাগিবেনে, বোন লাগিবে কিজেনি ? মুই ইদু কনবার ন' এয়ং। কাররে ন'য়' চিনং। মুই বালুক দুরতুন এয়ঙর। বেন্যাতুন ধুরি কিচ্ছু খেই ন' পাং। থায়-দে পক্ষে অলে মুই ভাদ খেই পেখে। কিচ্ছু মনে নগরিচ, ভুঝি দাগেখেইয়ে।

গিরোচ : আঃ সিয়েন কি। বেকুনোর আবদ-বিবদ আগেদ'।

গরবা : সিয়েন দ' এনে অয়। এ আধিক্যে গরি ধাহ্বা য়েই দিদ্দেৰী লাগানা আই।

গিরোচ : আঃ কি দিদ্দেৰী লাগানা। দাগ' কধাত আগে "গরবা ভিলে ঘরর লক্ষী"। ভুঝি দাক্কোস য়েকে, তুই বস্। মুই ভাদ-তোন জুতুলাংগোই।

গরবা : কিচ্ছু মনে ন' গরিচ ধাহ্বা য়েই দুগ দেনা। হামাক্কাই কন' উবোই নেই কিনেই

.....

গিরোচ : আঃ সিয়েন কি। তুই বচ্ মুই পিজোরোত যাঙর। (যেবগোই)

গরবা : ঠিগ আগে ভুঝি।

গায় গায় সিংগোবাত বোই আগে। কুদু য়েই ইবে কেন্দক্যা গম মিলা লাগত পেলগি এ-কধা সে-কধা ভাবের। হাক্কন বাদে একুয়' ১০/১২ বোজোয্যে পুয়' য়েই দাবা একুয়' দি-গেল'। দাবা খাদে খাদে আদিক্যা একান পুরোন কালর কধা মনত উদিল'। সিয়েন অলদে এদক্যো - গাবুজ্যো অজুত তে একদিনে চাংমা দোলি চেবাগেই য়েইয়ে। চাদে চাদে ধল্ পহর হোই উতোয়গি, ঘুম' এয়ের একা একা। হাম্মে-হাম্মেই কাবর চুবোর ঠিগ-তাগ গরি ব-ল'। চায়দে দোলি রাজা চেয়ারত বোই আগে। সেনাপতি তা দাগেন্দি থিয়েই আগে। রাজা এগামনে ভাবেগে ভাবের। হাক্কন বাদে রাজায় ঘ-র-র-রত-ঘ-র-র-রত গরি ঘুর কারের। বুঝি পান্ন'দে রাজা চিদে গন্তে গন্তে যদে পদে গুরি ঘুম য়েইয়ে। উন্দি রাজার ঘুম যানায়ান সেনাপতি-য় ঠাহ্র পেল'। হালিক কিঙরি রাজারে জাগেব চিদে গরের।

রাজা : সেনাপতি, সেনাপতি, তুই কুদু তুই কুদু, মহরে তুল, মহরে তুল।
 সেনাপতি : (রাজারে তুলিনেই) কত্তা আঃ কি হোইয়ে ?
 রাজা : সেনাপতি, মুই কি এক্কাণ অবিরিক-বারাক স্ববন দেলুং। কি অব কিজেনি।
 স্ববনান ভাঙিবার' দরাঙর।
 সেনাপতি : কি হোইয়ে কত্তা, তুই ভাঙি ক'।
 রাজা : সেনাপতি, স্ববনে দেলুং পিণ্ডিমি গির গিরেই উদের, রাজঘর ভাঙি পড়িল',
 সিংহাসন উল্লেই গেল', চেরকিতো দেবা কালা দেবা ঘুরুং গারাং গরে খারা
 যুদ্ধের। ম' প্রজাউন হোই গেলাক পাগল দোকান, তারারে তারা ন' চিনদোন।
 ন' চিনদোন বাব-হুই, ন' চিনদোন মা-বোন। ন' মানদন মা, বাব' কপা, ন
 মানদন বাবু-হুই কপা, কপা কপা জাদে জাদে কাবা-কাবি, জাদে জাদে
 মারি, মারি মারি কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা কপা
 সেনাপতি মহরে ধরিচ্ মহরে বিচ্ছেনিত নেজা। সেনাপতিয়ে রাজারে ধরি ধরি
 নি-গেলগোই। আজলে সে নাটক বোইয়ত এ কথানি নেই। রাজায় বানেই
 বানেই কোইয়েদে। রাজা সেনাপতি গেলাক্কোই। বাদবাকি দোলি মানুচ্চুনে
 বঃনিজেশ ইরি দি বিবদন্তন বাজিলাক।

সেক্ষে ভাদ-তোন রানা হোই আই ভাদ বারি দিনেই ঘর' গিরাচ্ছুয়াই কল' গি, অমকদ' পেটপরা খাবেলুং। আয় ভাদ খাগি। ভাদ পোয়োত ব-ল'। তে ভাদ খাহর, গিরোস্তে আনি দের। খাদে খাদে বারা ভাদ জামত চাইদে ভাদ নেই, গিরোস্তে আনি ন' দের। গিরোস্তেয়' সে কুরেবোই আগে। তুয়' কি আনি ন' দের। ইন্দি গরবার পেদ ন' ভরে। তে এককান বুদ্ধি গল্প। ভাদ থাল্লুয় আঙুল্লোই তক তক গরি বাজেই বাজেই কল', "ভুঝি এ-থাল্লুয় কমলে কিনোচ?"

গিরোজ' কম নয়। তে কোই পাল্লদে গরবার পেদ ন'ভরে। সেরেত গরি তে এককান বুদ্ধি কাধেল'। ধাবা পিজোরোত যেই ভাত রান্যাদে পিলেবো আনি গরবাবুয়'রে দেগেই কল'গি, ইয়ে ভেই এ ভাদ পিলোবোলোই সমরা-সমরি কিন্ৎগে। গরবার ভাদ রান্য়া পিলেবো রিনি চেল', গিরোজোর মুয়ান চেল' গিরোজে-গরবায় চোগে-চোগে চা-চি হলক। মু-চিমেই দুয়'জনে হারিয়ার। গরবায় হাদ দু-য়' গেল। গিরোস্তে থাল-কদরা পিজোরোত নিল'গোই।

জাক প্রকাশনা

০১. রাধামন-ধনপুদি পালা (ফুল পারা-২য়খন্ড)	১৯৮১
০২. ইরুক	১৯৮২
০৩. সত্রং	১৯৮২
০৪. পান্তলী	১৯৮৩
০৫. হিয়াংসিক	১৯৮৪
০৬. সাঙেত	১৯৮৪
০৭. রদঙ	১৯৮৫
০৮. এক ঝাক্ বিজোল রোদ	১৯৮৬
০৯. ইধ'রেগা (কজমা সংকলন)	১৯৮৬
১০. কবরক জুম আঙি যার আয়লুম	১৯৮৭
১১. কজ'ফুল (কজমা সংকলন)	১৯৮৭
১২. দিকপাদা (চাকমা বর্ণমালা বিষয়ক পত্রিকা)	১৯৮৭
১৩. বাগী (কাব্য গ্রন্থ)	১৯৮৭
১৪. কবিতা সংকলন	১৯৮৭
১৫. বিবু সংকলন	১৯৯০
১৬. Ray of Kajama	১৯৯০
১৭. আঙ	১৯৯১
১৮. গঙার	১৯৯২
১৯. সাঙু	১৯৯৩
২০. গোবোন (নাটক গ্রন্থ)	১৯৯৩
২১. লঙথঙ	১৯৯৪
২২. জুলি যার বুবর বুক	১৯৯৫
২৩. তানজাং	১৯৯৬
২৪. ঘিলে কোজোই	১৯৯৭

জাক মঞ্চায়িত নাটক

০১. আনত্ ভাজি উধে কা মু	১৯৮৩
০২. যে দিনত্ যে কাল,	১৯৮৪
০৩. বিবু রামর সর্গত যানা	১৯৮৫
০৪. আন্ধারত জুনি পহর (নাটিকা)	১৯৮৬
০৫. দেবংসি আধর কালা ছাবা	১৯৮৯ ও '৯৭
০৬. গোবোন	১৯৯০
০৭. মহেন্দ্রর বনভাঝ (রাঙামাটি ও ঢাকা)	১৯৯১
০৮. এক জুর মানেক	১৯৯২
০৯. কায় নায় নৈদা	১৯৯৩
১০. ঝরা পাদার জীংকানী	১৯৯৪
১১. জোঘ্য	১৯৯৪
১২. অদত্	১৯৯৫
১৩. আন্দালত্ পহর (মঞ্চস্থ ও ভিডিও)	১৯৯৬

বৈসুক-সাংগ্রাই-বিবু

উপলক্ষে

আমাদের শুভেচ্ছা



আগামী-তারকালোক পত্রিকা প্রকাশন লিঃ

ধানসিঁড়ি প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং লিঃ

তারকালোক কমপ্লেক্স

২৫/৩ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

হৃদয়ের ভাষা... কণ্ঠের ধ্বনি
তুলির টান... আর হৃদের স্পন্দন

এ সবই
সুন্দরের জন্য,
সত্যের জন্য,
মানুষের জন্য...



এশিয়াটিক এম সি এল

৪ নওরতন কলোনী

নিউ বেইলী রোড

ঢাকা-১০০০

টেলিফোন : ৯৩৩০১২৫, ৯৩৩০১২৬, ৪০৭৩৬৮

শিল্প বিপ্লব সার্থক করতে
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
বেসরকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের

- ☐ বিনিয়োগ পরামর্শ দান করে
- ☐ শিল্প সুবিধা প্রদানে সাহায্য করে
- ☐ কারখানা পরিচালনায় সাহায্য করে
- ☐ পণ্য বিপণনে সাহায্য করে
- ☐ প্রশিক্ষণ প্রদান করে
- ☐ নকশা বিতরণ করে



জনগণের সেবায়
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।